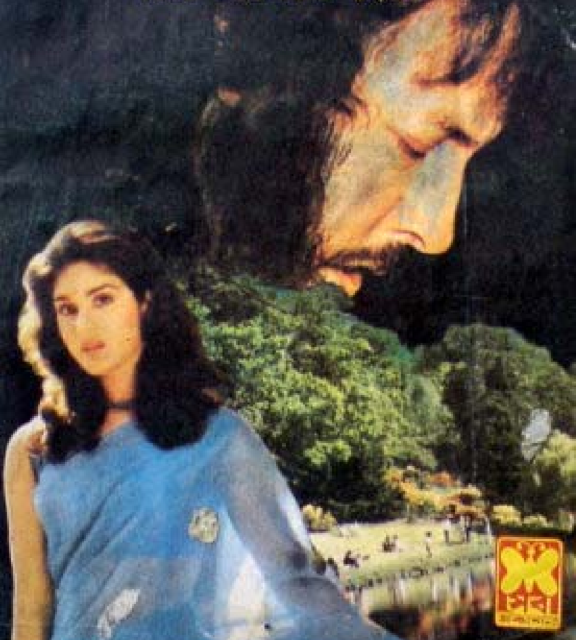
মাসুদ রানা

সত্যবাবা ১

কাজী আনোয়ার হোসেন



মাসুদ রানা

সত্যবাবা-১

কাজী আনোয়ার হোসেন

প্রথম প্রকাশ: মে, ১৯৯১

এক

রাত ঠিক পৌনে বারোটায় স্টেশনে পৌঁছুল ট্রেনটা। সাথে কোন সঙ্গী বা লাগেজ নেই, আরোহীদের সাথে নেমে এল একটা মেয়ে। শুধু সুন্দরী বা নিঃসঙ্গ বলে নয়, তার সন্ত্রস্ত হাবভাব অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করল। বেশ লম্বা মেয়েটা, একহারা গড়ন, তেইশ কি চব্বিশ হবে বয়স, সাজসজ্জায় অবহেলার ছাপ স্পষ্ট। কাপড়চোপড় দামী আর রুচিসম্মত হলেও, লাল স্কার্ট আর নীল শার্ট অনেক জায়গায় ভাঁজ খেয়ে কুঁচকে আছে, দু'এক জায়গায় লেগে রয়েছে শুকনো কাদা। ম্লান হয়ে আছে সরু ঠোঁট, ওখানে লিপস্টিকের খানিকটা ছোঁয়া থাকলে ভাল হত। বাঁ হাতে দামী রিস্টওয়াচ, ডান হাতটা খালি, খালি ফর্সা গলাটাও, অলঙ্কার বলতে কানে ছোট্ট একজোড়া রিঙ ঝুলছে। হাবভাব দেখে মনে হলো মানুষজনকে তার ভারি ভয়। আড়ষ্ট হয়ে আছে ঘাড়, যেন আশঙ্কা করছে কেউ তাকে ধরে ফেলবে। প্ল্যাটফর্ম থেকে ইতস্তত ভঙ্গিতে ওয়াটারলু স্টেশনের মূল ভবনে ঢুকল সে। হঠাৎ থমকে দাঁড়াল বুকস্টলটার সামনে।

স্টলের সামনে কয়েকটা দৈনিক পত্রিকা ঝুলছে, তার মধ্যে বেশিরভাগই আজ সন্ধ্যায় প্রকাশিত বিশেষ জরুরী সংস্করণ, নির্বাচন কমিশনের ঘোষণা উপলক্ষে ছাপা হয়েছে। বড় বড় হেডিঙে ছাপা হয়েছে খবরটা, 'আগামী জুনে সাধারণ নির্বাচন'। এখন বুঝতে পারছে মেয়েটা, কেন তারা নির্দেশটা দিয়েছিল, আর কেনই বা তাদের নির্দেশ অমান্য করে পালিয়ে আসার একটা তাগাদা অনুভব করে সে। এ-ধরনের কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে আন্দাজ করেই অস্থির হয়ে উঠেছিল তার মন।

স্টেশন থেকে বেরিয়ে আসার পর এই প্রথম টের পেল মেয়েটা, গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি হচ্ছে। সাহায্য দরকার তার, তাই আবার স্টেশনের ভেতর ফিরে এল। তার যা অবস্থা, যে জটিল বিপদের মধ্যে জড়িয়ে পড়েছে, এই অবস্থায় মাত্র একজনের কথাই মনে পড়ছে তার, যে তাকে সৎ পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করতে পারবে। একমাত্র সে-ই মন দিয়ে শুনবে তার কথা, তাকে বুঝতে চেষ্টা করবে, উদ্ধারের পথ বলে দেবে। টেলিফোন বুদগুলোর দিকে এগোল মেয়েটা।

তিনটে ফোনের দুটোরই রিসিভার চুরি গেছে। তৃতীয় বুদে ঢুকে ৩৭৬ নম্বর চেলসিতে ডায়াল করল সে। অপরপ্রান্তে রিঙ হচ্ছে, ব্যাকুল আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছে মেয়েটা। অনেকক্ষণ ধরে রিঙ হলো, কিন্তু কেউ রিসিভার তুলছে না। আরও কিছুক্ষণ চেষ্টা করার পর হাল ছেড়ে দিল সে। মাসুদ রানা বাড়িতে নেই, কিংবা হয়তো লন্ডনেই নেই। ভয় হলো, সে বোধহয় কেঁদে ফেলবে বা জ্ঞান হারাবে। মাসুদ রানা ছাড়া আর কারও কাছে যাবার কথা এতক্ষণ ভাবেনি সে। এখন বাধ্য হয়ে তাকে বাড়ি

ফিরতে হবে।

বাড়িতে ফেরার কোন ইচ্ছে তার নেই, কিন্তু নিরাপদ কোন বিকল্পও তার মনে পড়ল না।

আবার স্টেশনের বাইরে বেরিয়ে এসে দেখল, স্ট্যান্ডে কোন ট্যাক্সি নেই। বৃষ্টির বেগও আগের চেয়ে একটু যেন বেড়েছে। তবু ভাগ্য যে খুব বেশি দূর হাঁটতে হবে না। লংগেস্ট মাইল, ভাবল সে। হঠাৎ কেন কথাটা উদয় হলো মনে? তারপর স্মরণ হলো, ওটা একটা গানের লাইন। দ্য লংগেস্ট মাইল ইজ দ্য লাস্ট মাইল হোম।

ক্লান্ত পায়ে ওয়াটারলু স্টেশনকে পিছনে রেখে ইয়র্ক রোড ধরে এগোচ্ছে সে। ওয়েস্টমিনিস্টার ব্রিজটা পেরিয়ে এল। কাউন্টিহল-এ এখনও আলো জ্বলছে—ওটাকে দেখে যত না রাজধানীকেন্দ্রিক রাজনীতিকদের যুদ্ধক্ষেত্র, তারচেয়ে বেশি বিলাসবহুল হোটেল বলে মনে হলো। যানবাহন বা পথচারী এদিকটায় খুব কমই দেখতে পেল সে। তিনটে ট্যাক্সি পাশ কাটাল, একটাও খালি নয়। অদ্ভুত ব্যাপার, ভাবল সে। লন্ডনে একবার দু'এক ফোঁটা বৃষ্টি পড়লে হয়, ট্যাক্সি ড্রাইভাররা হয় বাড়ির পথ ধরবে নয়তো একটাও খালি পাওয়া যাবে না।

ব্রিজ পেরিয়ে ডান দিকে বাঁক নিল সে, ভিক্টোরিয়া এমব্যাঙ্কমেন্টে উঠে পড়ল। রাস্তার ওপারে, তার পিছনে, মাথা উঁচু করে রয়েছে বিখ্যাত বিগ বেন।

হেঁটে গেলে অ্যাপার্টমেন্টে পৌঁছুতে দশমিনিটের বেশি লাগবে না। বাড়ির কথাই ভাবছে মেয়েটা। ভাবছে তার অপ্রত্যাশিত প্রত্যাবর্তন কিভাবে নেবে মা-বাবা। মেয়েকে ফিরিয়ে আনার

জন্যে কত চেষ্টাই না করেছে তারা, কিন্তু তাদের কথায় কান দেয়নি সে। ভুল যা করার সে-ই করেছে, তার ব্যাপারে প্রথম থেকেই তাদের বক্তব্য সঠিক ছিল, এটা স্বীকার করতে না পারাটাই তার সমস্যা।

ভিক্টোরিয়া এমব্যাঙ্কমেন্টে ওঠার একটু পরই হঠাৎ সতর্ক হয়ে উঠল সে। উপলব্ধি করল, ব্রিজ পেরুবার সময় অন্যমনস্ক ছিল, চারদিকে নজর রাখার কথা মনে ছিল না। লোকজন তাকে খুঁজছে। রাতের পর যেমন দিন সত্যি, এ-ও তেমনি সত্যি। আস্ত ানা থেকে পালাবার সময় সতর্কতা অবলম্বন করেছিল সে। প্যাডিংটন স্কয়্যারে লোক রাখবে ওরা, কারণ ওটাই তার সম্ভাব্য পৌঁছুবার জায়গা। কয়েক ঘণ্টা সময় নষ্ট করে কয়েকবার ট্রেন আর বাস বদল করেছে সে, যাতে করে প্যাডিংটন দিয়ে লন্ডনে না ঢুকে ওয়াটারলু দিয়ে ঢুকতে পারে। তবে, সন্দেহ নেই, ওদের অ্যাপার্টমেন্টের ওপরও নজর রাখবে ওরা।

অন্যমনস্ক ছিল, তা নাহলে আরও আগেই দেখতে পেত ওদেরকে। হঠাৎ তার পথরোধ করে দাঁড়াল দু'জন যুবক। পথরোধ করে দাঁড়াল, কিন্তু কথা বলল নিজেদের মধ্যে। ওদেরকে দেখেই ঘাবড়ে গেল মেয়েটা, দাঁড়িয়ে পড়ল। পরমুহূর্তে বুঝল, তাকে ধরার জন্যে এ-ধরনের কাউকে পাঠানো হবে না।

'হাজার পাউন্ড বাজি, দোস্ত, কড়কড়ে দশটা একশো পাউন্ডের পাত্তি,' কোমরে হাত রেখে চ্যালেঞ্জের সুরে বলল একজন, তার সঙ্গীকে উদ্দেশ্য করে। 'শালী যাকে বলে একেবারে আনটাচড় ভার্জিন!'

'আরে রাখ!' তাচ্ছিল্যের সাথে হাত ঝাপটাল সঙ্গী ছোকরা।

'খেয়াল করেছিস, কোথাকার মেয়ে? নিশ্চয়ই এশিয়ার কোন তলাহীন ঝুড়ির ফাঁক গলে বেরিয়ে এসেছে। খেতে পায় না, বুঝলি, গতর বিক্রি করা পেশা! তবে, হ্যাঁ, আমাদের ভাগ্যটা ভাল। মাল বটে একখানা। বরং আয় বাজি রাখি, খেল কেমন দেবে...'

'ঠিক আছে, ওকেই জিজ্ঞেস করি আয়। এই যে...,' প্রথম যুবক মেয়েটার দিকে ফিরল, কোমরের বেল্ট খুলতে শুরু করেছে, 'তুমি কি... মানে, তোমার কি আসল কাজটা হয়েছে? মানে বিয়ে হলে যেটা হয় আর কি!'

কুৎসিত শব্দে হেসে উঠল তার সঙ্গী। 'শালা লজ্জা পায়!' মেয়েটার দিকে ফিরল সে, এক পা এগোল। 'এই যে, এশিয়ান কুইন, ভালয় ভালয় আমাদের সাথে যাবে? নাকি এখানে ফেলেই...?'

'দেখো, আমাদেরকে তোমার ভয় পাবার কোন কারণ নেই,' প্রথম যুবক গলাটা একটু নরম করার চেষ্টা করল। 'এ নতুন কিছু নয়, রাতবিরেতে লন্ডনের রাস্তায় কোন মেয়ে বেরুলে, এরকম একটু-আধটু ট্যাক্স দিতে হয়। আমরা শুধু তোমার অনুমতি চাইছি, জোরজার করছি না। বৃষ্টির রাত, বুঝতেই পারছ...'

বাতাসে মদের তীব্র গন্ধ পেল মেয়েটা।

ধীরে ধীরে কাছে চলে আসছে মাতাল দু'জন।

পিছু হটতে শুরু করল মেয়েটা। উদ্‌ভ্রান্তের মত এদিক ওদিক তাকাল বার কয়েক। আলো খুব কম, যত দূর দৃষ্টি যায় খাঁ-খাঁ করছে। হঠাৎ বাধা পেয়ে আহত পশুর মত অস্ফুট কাতর একটা

ধ্বনি বেরিয়ে এল গলা থেকে। পাঁচিলে পিঠ ঠেকে গেছে।

ওকে পিছু হটতে দেখে আরও দ্রুত সামনে বাড়ল মাতাল দু'জন। এই সময় পাঁচিলের গায়ে ফাঁকটা পেয়ে গেল সে। ঝট্ করে ঘুরল, ফাঁকটা গলে ছুটল, নদীর দিকে নেমে যাওয়া সিঁড়ির ধাপের ওপর আরেকটু হলে আছাড় খেতে যাচ্ছিল। তীরবেগে সিঁড়ি বেয়ে নামছে তো নামছেই। কাঁধের সাথে স্ট্র্যাপ দিয়ে আটকানো হাতব্যাগটা এক হাতে খামচে ধরে আছে। আতঙ্ক যেন তার মাথার ভেতর আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে তার, পেটের ভেতর সব কেমন যেন ওলটপালট হয়ে যাচ্ছে।

পিছু নিয়েছে ওরা, চওড়া ধাপে ওদের জুতোর শব্দ কাছে চলে আসছে।

পানির গন্ধ পেল মেয়েটা। সেই সাথে আতঙ্ক যেন শতগুণ বেড়ে গেল। বাঁচার কোন পথ নেই। নদী পেরিয়ে ওপারে চলে যাওয়া সম্ভব নয়, কারণ সাঁতার জানে না সে। এই চরম বিপদের মধ্যেও রানার হাসিমাখা মুখটা তার চোখের সামনে ভেসে উঠল, ওকে বলছে: বাঙালী মেয়ে অথচ সাঁতার জানো না!

নদীর দু'দিকে তাকাল সে। কোথাও একটা বোট নেই যে আশ্রয় নেবে। তার সামনে লোহার পোল রয়েছে সার সার, একটার সাথে আরেকটা চেইন দিয়ে জোড়া ।

তার পিছনে প্রায় পৌঁছে গেছে ওরা, এই সময় ঘুরে দাঁড়াল মেয়েটা। দৃঢ়প্রতিজ্ঞ একটা ভাব এসে গেছে তার চেহারায়, একাই ওদের সাথে লড়বে সে। তার মনে পড়ে গেছে, এম.ভি.এফ. সত্যবাবা বলেছেন, আসল কথা হলো কৌমার্য। সবাই তারা এই একই কথা বলে। যে-কোন মূল্যে দৈহিক পবিত্রতা রক্ষা করতে

হবে।

পিছু হটল মেয়েটা, হাঁটুর পিছনে চেইনের ছোঁয়া লাগতে আরেকটু হলে চিৎকার উঠেছিল। সত্যবাবার কথা মনে পড়ায় নতুন শক্তি, বিপুল প্রেরণা এসে গেছে তার মধ্যে। বলতে পারবে না কিভাবে সে একলাফে পার হয়ে এল চেইনটা। যে-কোন মূল্যে সতীত্ব রক্ষা করতে হবে, এই একটা চিন্তা আর সব চিন্তাকে বিতাড়িত করল। আঁতকে উঠল গুণ্ডারা, হাঁ-হাঁ করে ছুটে এল তাকে বাধা দেয়ার জন্যে। সেই মুহূর্তে ভারসাম্য হারিয়ে ফেলল মেয়েটা, পিচ্ছিল ধাপে পা পিছলে গেল, পা থেকে খুলে গেল একপাটি জুতো। চেইনের একটা লিঙ্কের সাথে তার স্কার্ট আটকে গেছে, ফলে নিচের দিকে কয়েক সেকেন্ড ঝুলে থাকল তার মাথা। পরমুহূর্তে পানিতে পড়ল সে।

‘উঠে এসো বলছি! ভাল চাও তো...’ দ্বিতীয় যুবক চেইন টপকাবার চেষ্টা করছে ।

পানির সাথে ধস্তাধস্তি শুরু করল মেয়েটা। অসম্ভব ভারী লাগছে নিজেকে তার। কে যেন চিৎকার করছে বলে মনে হলো, এক সেকেন্ড পর বুঝতে পারল ওটা তার নিজেরই কাশির শব্দ। আতঙ্কে কুণ্ডলী পাকিয়ে লোহার মত শক্ত আর নিরেট হয়ে গেল শরীরটা। চারদিকে শুধু অন্ধকার। জানে, ডুবছে সে। আশ্চর্য একটা দুর্বলতা অনুভব করল, যেন ঘুম পাড়াবার জন্যে ওষুধ খাওয়ানো হয়েছে তাকে। তার মনে পড়ল, সত্যবাবাকে চল্লিশ হাজার পাউন্ড দিয়েছে সে। না জানি কেমন হবে তার স্বর্গবাস! ওটাই ছিল তার শেষ চিন্তা।

দুই

ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিস হেডকোয়ার্টারে কাজকর্ম সব লাটে উঠেছে। অসংখ্য সমস্যা নিয়ে এতই ব্যস্ত হয়ে আছেন অ্যাডমিরাল মারভিন লংফেলো যে স্পেশাল ব্রাঞ্চ থেকে আসা ভদ্রলোকের সাথে দেখা পর্যন্ত করতে পারছেন না।

রিজেন্ট পার্কের কাছাকাছি বিশাল অফিস বিল্ডিংটায় হিসাব-পত্র ঠিকঠাক করার কাজ চলছে। কাজটা অস্বস্তিকর, জটিল আর সময়সাপেক্ষ। গত এক বছরে দুর্দমনীয় ইউরোপিয়ান টেরোরিস্ট গ্রুপগুলো ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসের প্রায় ষাট মিলিয়ন পাউন্ডের আর্থিক ক্ষতি করেছে, অথচ স্যাবোটাজ খাতে এক ফার্দিংও খরচ দেখানো যাবে না, কারণ তা হলে আগামী আর্থিক বছরের বাজেট অর্ধেক কমিয়ে দেবে জাতীয় অর্থনৈতিক কমিটির সদস্যরা।

এক হপ্তা হয়ে গেল এখানে আড্ডা গেড়েছে অডিটর বাহিনী। জরুরী কাজের জায়গা দখল করে নিয়েছে তারা, প্রতিটি ডিপার্টমেন্টের অ্যাকাউন্ট চেকিং আর রিচেকিং করছে, অবিবেচকের মত কেড়ে নিচ্ছে সিনিয়র অফিসারদের মূল্যবান কর্মঘণ্টা। প্রতি বছরের মত এবারও অডিটের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে ইডিউস চার্টার্ড অ্যাকাউন্টস অ্যান্ড কনসালট্যান্সি ফার্মকে।

বেশ কিছুদিন হলো ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসের কাভার বদলে

নতুন নামকরণ করা হয়েছে ইন্টারন্যাশনাল ট্রেডিং এজেন্সি (প্রাইভেট লিমিটেড)। বিদেশে দক্ষ জনশক্তি রফতানী থেকে শুরু করে আন্তর্জাতিক টেন্ডারে অংশগ্রহণ, আমদানী-রফতানী ইত্যাদি সব ধরনের কাজই করা হয়। শুধু ব্যবসার দিক থেকে বিবেচনা করলে, ইন্টারন্যাশনাল ট্রেডিং এজেন্সি লাভজনক একটি প্রতিষ্ঠান। স্যাবোটাজের দরুন যে আর্থিক ক্ষতি সেটা পুষিয়ে নিতে সহায়ক ভূমিকা রেখেছে প্রতিষ্ঠানটি। অস্তিত্ব হারাবার ভয় কাটিয়ে ওঠার পর আজ যে ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিস কাজ চালিয়ে যেতে পারছে, এর জন্যে ব্যবসার দিকগুলো যারা দেখাশোনা করেন সেই সব অফিসারদের প্রতি কৃতজ্ঞ বোধ করেন মারভিন লংফেলো। তবে ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসের অস্তিত্ব রক্ষা পাওয়ায় চিরঋণী হয়ে আছেন তিনি বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স-এর চীফ মেজর জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) রাহাত খান ও বি. সি. আই-এর অন্যতম দুর্ধর্ষ এজেন্ট মাসুদ রানার প্রতি। তিনি জানেন, ব্রিটিশ জাতি এই দুজনের ঋণ কোন দিন শোধ করতে পারবে না।

অডিটের ঝামেলা এখনও শেষ হয়নি, তার ওপর গোদে বিষফোঁড়া হয়ে দাঁড়াল সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের ঘোষণা। নির্বাচন হয়ে যাওয়ার পরও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সেই পুরানো আমলাদের সাথেই কাজ করতে হবে বি.এস.এস. চীফ মারভিন লংফেলোকে, কারণ সরকার আসে সরকার যায়, কিন্তু আমলারা স্থানচ্যুত হয় না। তবু, নতুন সরকারের নীতি কি হবে তার ওপর নির্ভর করবে বি. এস. এস-এর কাজের ধারা ও প্রকৃতি। তাই সরকার বদল হলে বা শুধু বদল হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিলেও

মারভিন লংফেলোর মনে ধারাল ছুরির ভূমিকা নেয় উদ্বেগ আর দুশ্চিন্তা। শুধু আজকের দিনটাতেই সরকারী ও বিরোধী দলের প্রভাবশালী সদস্যদের সাথে পাঁচটা বৈঠক করতে হয়েছে তাঁকে, জয়েন্ট ইন্টেলিজেন্স কমিটির চেয়ারম্যান-এর সাথে লাঞ্চও খেতে হয়েছে।

স্পেশাল ব্রাঞ্চ থেকে আগত ভদ্রলোক জানিয়েছেন, ব্যাপারটা জরুরী। বিষয়টা নিয়ে শুধু বি.এস.এস. চীফ মারভিন লংফেলোর সাথে আলাপ করা যাবে। চট করে একবার হাতঘড়িটা দেখে নিল এলিজাবেথ, মারভিন লংফেলোর প্রাইভেট সেক্রেটারি। পুলিস অফিসার ভদ্রলোককে প্রায় এক ঘণ্টা হলো অপেক্ষা করিয়ে রাখা হয়েছে। আগাম কোন খবর না দিয়ে পৌঁছেছেন তিনি, মারভিন লংফেলো লাঞ্চ থেকে ফেরার দশ মিনিট আগে।

বড় করে শ্বাস টেনে সাহস সঞ্চয় করল এলিজাবেথ, ইন্টারকমের বোতামে আস্তে করে চাপ দিল।

'ইয়েস?' হুঙ্কার ছাড়লেন অ্যাডমিরাল।

'পুলিস সুপার মি. জেফারসন এখনও অপেক্ষা করে আছেন, স্যার,' স্পষ্টকণ্ঠে, দৃঢ়তার সাথে কথা বলে নিজেকে একজন দক্ষ সেক্রেটারি হিসেবে প্রমাণিত করতে চাইল এলিজাবেথ। জানে, কেউ আমতা আমতা করলে রেগে যান বস্।

'কে?' কিছু মনে থাকে না, এরকম একটা ভান করে গুরুত্বহীন কাজগুলোকে এড়িয়ে যাওয়ার পুরানো কৌশলটা আজও ব্যবহার করেন মারভিন লংফেলো।

'স্পেশাল ব্রাঞ্চের অফিসার ভদ্রলোক,' মনে করিয়ে দিল এলিজাবেথ।

‘তাঁর সাথে আমার কোন অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে?’ বেসুরো গলায় বললেন বি.এস.এস. চীফ।

‘না, স্যার, তবে স্পেশাল ব্রাঞ্চের ডিরেক্টরের পাঠানো চিঠিটা আপনার ডেস্কে রেখে এসেছি, আপনি যখন লাঞ্চে ছিলেন। তাঁর অনুরোধের ভাষা দেখে মনে হয়েছে, ব্যাপারটা জরুরী।’

‘ব্যাপার কি...একজন স্পেশাল ব্রাঞ্চের সুপার...’ বিরক্তি প্রকাশ করলেন মারভিন লংফেলো। ‘আমাদের কাছে ধর্ণা দেয়ার মানে কি? নিজেদের সমস্যা নিজেরা সামলাতে পারে না? সমস্যাটা কি, বলেছে কিছু?’

‘জ্বী-না, স্যার। ডিরেক্টর শুধু অনুরোধ করেছেন, তিনি চান আপনি যেন তাঁর অফিসারের সাথে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কথা কলেন।’

‘নামটা কি যেন বললে?’

‘উইলবার জেফারসন, স্যার। পুলিস সুপারিনটেনডেন্ট।’

অপরপ্রান্তে মুহূর্তের নীরবতা, তারপর এলিজাবেথ শুনতে পেল, ‘ঠিক আছে, নিয়ে এসো তাঁকে।’

দেখা গেল, পুলিস সুপার উইলবার জেফারসন বিশালদেহী পুরুষ, পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ বছর বয়েসেই বিরাট একটা ভুঁড়ি বাগিয়েছেন। দামী কাপড়ের স্যুট পরেছেন তিনি, সেলাইয়ের কাজটা নামকরা কোন টেইলারিং শপের বলেই ধারণা করা যায়। মারভিন লংফেলো লক্ষ করলেন, টাইয়ের নটটা বাঁধা হয়েছে নিখুঁতভাবে। হাসিখুশি ভদ্রলোক, চেহারায় সুখী ও প্রশান্ত একটা ভাব। ‘আমাদের আগে কখনও দেখা হয়নি, স্যার। আমার নাম উইলবার জেফারসন।’ হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে সরাসরি প্রসঙ্গে চলে

এলেন ভদ্রলোক। 'এস.বি. ডিরেক্টর ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন, আসলে সারাটা দিনই আজ তিনি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে আটকা পড়ে থাকবেন। প্রধানমন্ত্রী মফস্বল শহরগুলো ট্যুর করছেন তো, ঝামেলার অন্ত নেই।'

'ঝামেলা থেকে কেই-বা মুক্ত! তা ব্যাপারটা কি, সুপার?'

'ব্যাপারটা ঠিক স্বাভাবিক নয়, স্যার। উঁহুঁ। সেজন্যেই তো ডিরেক্টর সাহেব সরাসরি আপনার সাথে কথা বলার জন্যে পাঠালেন আমাকে।'

মুখ তুলে তাকিয়ে থাকলেন মারভিন লংফেলো, চেহারায় কোন ভাব প্রকাশ পেল না। অবশেষে হাত ইশারায় ভদ্রলোককে একটা চেয়ার দেখালেন তিনি।

পুলিস সুপার বসলেন।

'তাহলে শুরু করুন,' শান্তসুরে বললেন মারভিন লংফেলো। 'সংক্ষেপে।'

খুক করে কেশে গলা পরিষ্কার করলেন পুলিস সুপার। 'আজ খুব ভোরে নদী থেকে একটা লাশ উদ্ধার করা হয়েছে...' নাটকীয় ভঙ্গিতে বিরতি নিলেন তিনি।

মারভিন লংফেলো কোন প্রশ্ন বা মন্তব্য করলেন না।

'ক্লিওপেট্রা নিডল্-এর কাছে রিভার পেট্রল লাশটা উদ্ধার করে। এখনও কোন প্রেস বিজ্ঞপ্তি দেয়া হয়নি, তবে তদন্ত শুরু করেছি আমরা ভোর থেকেই। লাশটা কার? ভি. আই. পি, স্যার। ব্যাপারটা বিশেষ করে নাজুক এই জন্যে যে মেয়েটি জন্মসূত্রে ব্রিটিশ হলেও, ষাটের দশকে তার পরিবার এ-দেশে আসে, এবং নাগরিকত্ব গ্রহণ করে। তার বাবা লন্ডনের একজন বিশিষ্ট

ভদ্রলোক। আমাদের ডিরেক্টর নিজেই দুঃসংবাদটা তার পরিবারকে জানিয়েছেন। মেয়েটার বয়স বাইশ, স্যার। মিস নাদিরা রহমান, মিস্টার মোখলেসুর রহমানের একমাত্র কন্যা।'

'মার্চেন্ট ব্যাংকার?' মারভিন লংফেলোর চোখ দুটো সামান্য উজ্জ্বল হলো, যেন এতক্ষণে আগ্রহ বোধ করছেন তিনি।

মাথা ঝাঁকালেন পুলিস সুপার। 'জ্বী, স্যার। ইডিউস অ্যাকাউন্টস অ্যান্ড কনসালট্যান্সির চেয়ারম্যানও তিনি।'

'হ্যাঁ, জানি।' বি.এস.এস. চীফ ভাবলেন, পুলিস সুপার কি জানেন, ইডিউস বোর্ডের একজন উপদেষ্টা এই মুহূর্তে উপস্থিত রয়েছেন এখানে? 'আত্মহত্যা?' জানতে চাইলেন তিনি, অভিজ্ঞ ইন্টারোগেটর বা সাতঘাটের পানি খাওয়া কোন পুলিস অফিসারও বলতে পারবে না তাঁর মাথার ভেতর কি চলছে।

'মনে হয় না, স্যার। পোস্টমর্টেম করা হয়েছে। বলা হয়েছে, পানিতে ডুবে মারা গেছে। পাঁচ কি ছ'ঘণ্টা ছিল নদীতে। সম্ভবত দুর্ঘটনা।'

'তাহলে?' অর্থাৎ সমস্যাটা কোথায়?

'দু'একটা ব্যাপারে একটু খটকা লাগছে, স্যার। কিছু দিন হলো হেরোইনের নেশা ত্যাগ করেছিল মেয়েটা। পারিবারিক বন্ধুরা বলছে, মাস দুই হলো একদম ছোঁয়নি। তবে তার মা-বাবার সাথে এই বিষয়টা নিয়ে এখনও আমরা কথা বলিনি।'

মাথা ঝাঁকালেন বি.এস.এস. চীফ, পুলিস সুপারকে তাঁর কথা শেষ করার সুযোগ দিয়ে চুপ করে থাকলেন।

'ধর্মীয় একটা সংগঠন, নামটা আপনিও নিশ্চয়ই শুনেছেন, স্যার...খানিকটা হাস্যকর আর হয়তো উদ্ভটও বটে...নিজেদেরকে

ওরা সত্য সমিতির সদস্য বলে ।’

‘আবছাভাবে, হ্যাঁ,’ বললেন মারভিন লংফেলো। ‘ভগবান রজনীশ, সাঁইবাবা, গুরুমহিম–এদের সংগঠনের সাথে ওটার বোধহয় মিল আছে, তাই না?’

ঘন ঘন মাথা নাড়লেন উইলবার জেফারসন। ‘ঠিক তা নয়, স্যার। আপনি বরং অমিলটাই বেশি দেখতে পাবেন। একটা ধর্মীয় দর্শন আছে বটে ওদের, কিন্তু সেটা অন্যান্য সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীর দর্শন থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যায়, সত্য সমিতির প্রতিষ্ঠাতা সত্যবাবা নাদিরা রহমানকে হেরোইনের অভিশাপ থেকে মুক্তি দিয়েছিল। এ-ব্যাপারে প্রায় কোন সন্দেহ নেই। নৈতিক সততা, চারিত্রিক পবিত্রতা, আদর্শ জীবনযাপন, এ-সবের ওপর অত্যধিক গুরুত্ব দেয় ওরা...’

বি.এস.এস. চীফ শুনে যাচ্ছেন, চেহারায় আগ্রহ বা বিতৃষ্ণা কোনটাই নেই।

‘ওদের একটা আখড়াও আছে, ট্রেনিং সেন্টার বলতে পারেন, প্রাপ্তবয়স্ক ছেলে আর মেয়েদের সংখ্যা প্রায় সমান, কিন্তু অবাধ মেলামেশা গুরুতর পাপ বলে গণ্য করা হয়। সেরকম কোন ইচ্ছে হলে, বিয়ে করতে হয় ওদেরকে। বিয়েটা রেজিস্ট্রি করা হতে হবে। পুরানো ধ্যান-ধারণা আর মূল্যবোধের ওপর জোর দেয় ওরা, তবে নৈতিকতা বাদ দিলে অন্যান্য বিষয়ে অদ্ভুত সব ধারণা পোষণ করে...’একঘেয়ে সুরে বলে চলেছেন পুলিস সুপার।

‘কিন্তু,’ তাঁকে বাধা দিলেন মারভিন লংফেলো, ‘আমি ঠিক বুঝতে পারছি না, কেসটার সাথে আমাদের কি সম্পর্ক।’

'সম্পর্কটা, স্যার, মিস নাদিরা রহমান। আমরা অন্তত দুটো অদ্ভুত জিনিস পেয়েছি তার কাছে থেকে। লাশটা পানি থেকে তোলার পর দেখা গেল, একটা হাতব্যাগ আঁকড়ে ধরে আছে তখনও। ভাল করে বন্ধ করা ছিল, ব্যাগটাও দামী, ভেতরে পানি ঢোকেনি।'

'বেশ,' বললেন মারভিন লংফেলো। 'পানি ঢোকেনি। অদ্ভুত জিনিস আর কি পাওয়া গেছে?'

'প্রথমে নোটবুকটার কথাই বলি। ঠিকানা আর ফোন নম্বর লেখার সবগুলো পাতা ছিঁড়ে নেয়া হয়েছে, একটা বাদে। ওই একটাতে কোন ঠিকানা নেই, আছে শুধু একটা নামের নিচে টেলিফোন নম্বর, লেখা হয়েছে চলতি হপ্তায়। আমার ধারণা, নম্বরটা লেখা হয়েছে স্মৃতি থেকে। একটা সংখ্যা কেটে তার জায়গায় সঠিক সংখ্যা লেখা হয়েছে।'

'তো কি হয়েছে?'

'নম্বরটা স্যার...আমাদের ডিরেক্টর বলেছে, আপনার একজন বিশেষ পরিচিতর।'

'তাই?'

'শুনলাম ভদ্রলোক ব্রিটিশ নন, তাসত্ত্বেও তাঁকে নাকি ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসে অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ একটা স্থান দেয়া হয়েছে। ভদ্রলোকের নাম মাসুদ রানা, স্যার।'

'ও।' মনে মনে এস.বি. ডিরেক্টরের মুণ্ডুপাত করলেন মারভিন লংফেলো। একটা জাতীয় নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠানের প্রধান হিসেবে গোপন তথ্যটা তাঁর জানা থাকতে পারে, কিন্তু তাই বলে তিনি তাঁর একজন পুলিস সুপারকে কথাটা বলে দিতে পারেন না। রাগ

চেপে রেখে ইতোমধ্যে পাওয়া তথ্যের সাথে প্রাসঙ্গিক কয়েকটা ব্যাপার মেলাবার চেষ্টা করলেন মারভিন লংফেলো। তারপর বললেন, 'আপনি যাঁর কথা বলছেন, এই মুহূর্তে লন্ডনে নেই তিনি।' এক সেকেন্ড বিরতি নিলেন। 'আপনি যদি তাঁর সাথে কথা বলতে চান, তাঁকে আমি ফিরিয়ে আনতে পারি। যদি মনে করেন আপনাদের তদন্তে সাহায্য করতে পারবেন তিনি...'

'অবশ্যই তিনি সাহায্য করতে পারবেন, স্যার। তবে, আরও কিছু ব্যাপার আছে।'

চোখ নামিয়ে হাতঘড়ির দিকে তাকালেন মারভিন লংফেলো।

শিরদাঁড়া খাড়া হয়ে গেল উইলবার জেফারসনের, তাড়াতাড়ি শুরু করলেন তিনি, 'আমার বিশ্বাস, স্যার, লর্ড ওয়ালটন চেস্টারফিল্ড–তিনিও ইডিউস-এর–আপনাদের অফিসে কাজ করছেন। তাঁর সাথেও আমার কথা বলা দরকার।'

'কেন?' ভুরু সামান্য একটু কুঁচকে উঠল মারভিন লংফেলোর।

'তাঁর মেয়ে–ডোনা চেস্টারফিল্ড–নাদিরা রহমানের ঘনিষ্ঠ বান্ধবীদের একজন ছিল। তারও একই ধরনের ড্রাগ প্রবলেম ছিল, সে-ও সত্য সমিতির একজন সদস্যা। যতটুকু জানতে পেরেছি, মেয়ের এই ব্যাপারটা নিয়ে ভারি উদ্বেগের মধ্যে আছেন লর্ড ওয়ালটন চেস্টারফিল্ড।'

'মি. চেস্টারফিল্ডের সাথে আপনি দেখা করতে চান এখানে? আমাদের এই অফিসে?' বি.এস.এস. চীফ এরই মধ্যে চিন্তা করছেন, লর্ড চেস্টারফিল্ডকে কিভাবে সাহায্য করতে পারেন তিনি। বি.এস.এস-এর বাজেট বাড়াতে হলে এই ভদ্রলোকের

সাহায্য দরকার হবে তাঁর। ইডিউস-এর উপদেষ্টা, এটাই ভদ্রলোকের একমাত্র পরিচয় নয়, একটা ব্যাংকের ডিরেক্টর ছাড়াও জাতীয় অর্থনৈতিক কমিটির অন্যতম প্রভাবশালী সদস্যও বটেন।

'আমি আসলে মি. মাসুদ রানার সাথে আগে কথা বলতে চাই, স্যার,' বললেন পুলিস সুপার, চেহারায় কোন ভাব থাকল না। 'তাঁর কি বলার আছে সেটার ওপর নির্ভর করে, লর্ড চেস্টারফিল্ডের উপস্থিতিতে আমরা হয়তো অন্য আরেকটা বিষয়ে কথা বলতে পারি।'

মাথা ঝাঁকিয়ে ইন্টারকমের দিকে হাত বাড়ালেন মারভিন লংফেলো, এলিজাবেথকে নির্দেশ দিলেন, 'যত তাড়াতাড়ি সম্ভব লন্ডনে ফিরে আসতে বলো রানাকে। কখন পৌঁছুবে, আমার জানা দরকার। তার জন্য অফিসে অপেক্ষা করব আমি, পৌঁছুতে রাত হলেও।' রিসিভার নামিয়ে রাখার সময় ভুরু জোড়া সামান্য কুঁচকে থাকল তাঁর। ব্যাপারটা অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি যে ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসের একমাত্র সুবন্ধু বলতে গেলে এখন মাসুদ রানা। ওকে নিয়ে কোন ঘটনা ঘটলে বা শুধু ঘটবার সম্ভাবনা দেখা দিলেও নার্ভাস বোধ করেন তিনি। তাছাড়া, ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে কাজ করার ফলে রানার প্রতি তাঁর খানিকটা স্নেহ-ভালবাসাও জন্মেছে।

আউটার অফিসে আপনমনে হাসছে এলিজাবেথ। রানাকে তো চমকে দেয়া যাবেই, বেশ কিছু দিন পর আবার ওকে দেখতে পাবার সুযোগও হবে তার। মানুষটাকে একবার যে চিনেছে, ভাল না বেসে উপায় নেই তার। কিন্তু হায়, তাবৎ নারীকুলের জন্যে দুঃসংবাদ, তাদের কারও ফাঁদে পা দেয়ার দুর্বলতা নিয়ে জন্মায়নি সে। নাকি হিসেবে ভুল হচ্ছে, জোঁকের মত লেগে থাকলে

বিড়ালের ভাগ্যে শিকে ছিঁড়লেও ছিঁড়তে পারে? লাল ফোনের রিসিভারটা তুলে নিয়ে তালিকায় নেই এমন একটা নম্বরে ডায়াল করল সে। হেরিফোর্ড-এর ফরেস্ট ক্যাম্পের সাথে যোগাযোগ করছে।

তিন

শেষবার কবে এরকম বিধ্বস্ত আর ক্লান্ত লেগেছিল, মনে করতে পারল না মাসুদ রানা। প্রতিটি পেশী ব্যথা করছে, মারাত্মক কোন বিষ যেন হাড়গুলোকে ছাতু বানিয়ে দিয়েছে। পা দুটো সীসার তৈরি বলে মনে হলো, বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করল ভারী বুটের ভেতর আগুন জ্বলছে ওগুলোয়, প্রতিটি পায়ের ওজন হবে তিন মন, ফলে প্রতিবার পা ফেলার জন্যে সচেতন প্রয়াস দরকার হচ্ছে। চোখের পাতা ঝুলে পড়েছে, একই সময় একাধিক ব্যাপারে মন দিতে পারছে না। এ-সব বাদে, নিজেকে সাংঘাতিক নোংরাও লাগছে ওর। ঘামের ধারাগুলো ভিজিয়ে দিয়েছিল কাপড়চোপড়, তারপর সব শুকিয়ে যায়, আবার নতুন করে ঘামতে শুরু করেছে। মরুভূমিতে হারিয়ে যাওয়া কোন লোক মরুদ্যান দেখতে পেলে যেরকম খুশি হয়, বেডফোর্ড ট্রাকটাকে দেখে রানাও সেরকম খুশি হলো। তবে, রানা আসলে কোন মরুভূমিতে নেই, কোথাও হারিয়েও যায়নি। আজ দশদিন হলো অস্তিত্ব রক্ষা ও সহনশীলতার পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করছে ও। এ-

ধরনের ট্রেনিঙের ব্যবস্থা প্রতি তিন বছরে একবার করা হয়, ব্রিটিশ সামরিক বাহিনীর তরফ থেকে। ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিস প্রতিবারই তাদের নিজেদের একজনকে এই ট্রেনিং নেয়ার জন্যে পাঠায়। তিন বছরের সমস্ত কর্মকাণ্ড ও সাফল্যের গুণগতমান বিশ্লেষণ করে মাত্র একজনকে বাছাই করা হয়। অন্যান্য বার সিলেকশন কমিটি বিকট সমস্যায় পড়ে, কারণ চুলচেরা হিসেবেও দেখা গেছে বহু এজেন্টের সাফল্য প্রায় সমান, তাদের মধ্যে থেকে একজনকে ট্রেনিঙের জন্যে পাঠানো হলে বাকি এজেন্টদের ওপর এক ধরনের অবিচার করা হয়। অথচ এই ট্রেনিঙে অংশগ্রহণ করতে পারা শুধু যে মর্যাদার প্রতীক তাই নয়, নির্দিষ্ট কিছু উঁচু পদে উঠতে হলে এবং দুর্লভ কিছু সুযোগ-সুবিধে পেতে হলে প্রথমেই খোঁজ নেয়া হয় এই বিশেষ ট্রেনিংটা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নেয়া আছে কিনা। ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসের প্রতিটি এজেন্টের গোপন আশা, একদিন তাকে এই ট্রেনিঙের জন্যে ডাকা হবে। তবে এ-বছর সিলেকশন কমিটিকে কোন রকম ঝামেলা পোহাতে হয়নি। তাদের সামনে প্রার্থী ছিল একজনই। সর্বসম্মতিক্রমে রানার নামটা পাস হয়ে গেছে, যদিও রানা বি.এস.এস-এর কর্মচারী নয়। ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসের ইতিহাসে এটা একটা ব্যতিক্রমী ঘটনা।

কারণটা কি? ব্রিটিশরা মাছে-ভাতে বাঙালীদের ওপর হঠাৎ এত উদার হয়ে উঠল কেন?

উদারতার নয়, ব্যাপারটা আসলে কৃতজ্ঞতার প্রকাশ। এবার নিয়ে দু'বার ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসের অস্তিত্ব রক্ষা করেছে, বি.সি.আই. আক্ষরিক অর্থেই।

প্রথমবার বি.এস.এস-এর অস্তিত্ব বিপন্ন হয় বেশ কয়েক বছর আগে, প্রতিদ্বন্দ্বী কয়েকটা ইন্টেলিজেন্স সার্ভিসের কিছু এজেন্ট ভোল পাল্টে ভেতরে ঢুকে পড়ায় এবং পুরানো ও বিশ্বস্ত কিছু এজেন্ট মোটা টাকার বিনিময়ে দু'মুখো সাপের ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়ায়। চোর বাছতে গাঁ উজাড় অবস্থা। বোঝাই যাচ্ছিল না কে দেশপ্রেমিক আর কে বিশ্বাসঘাতক। রাষ্ট্রীয় গোপন তথ্য অবাধে পাচার হয়ে পৌঁছে যাচ্ছিল শত্রুদেশগুলোয়। এই বিপদে বি.সি.আই. সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়, বি.সি.আই. এজেন্ট মাসুদ রানার তৎপরতায় একে একে ধরা পড়তে শুরু করে ডাবল এজেন্টরা। সে-যাত্রা অস্তিত্ব রক্ষা পেলেও, ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিস ভয়ানক দুর্বল হয়ে পড়ে। গুরুত্বপূর্ণ বা বিপদসংকুল কোন অ্যাসাইনমেন্টে পাঠাবার মত লোক তাদের ছিল না। মাঝে মধ্যেই রানা এজেন্সি বা বি. সি. আই-এর সাহায্য চাইতে হচ্ছিল। এভাবে বেশ কিছুদিন চলার পর হঠাৎ করে আবার বিপর্যয়ের মুখে পড়ল ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিস। এবার তারা আক্রমণের শিকার হলো দুর্ধর্ষ ইউরোপিয়ান টেরোরিস্ট গ্রুপগুলোর।

এর জন্যে দায়ী একটা ভুল সিদ্ধান্ত। টেরোরিস্ট গ্রুপগুলো বাড়াবাড়ি শুরু করায় তাদের শায়েস্তা করার জন্যে বিভিন্ন ইন্টেলিজেন্স সার্ভিসের সাহায্য চেয়ে আবেদন জানায় ইন্টারপোল। নিজেদের দুর্বলতার কথা মনে রেখে ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসের উচিত ছিল সহায্যের আবেদন প্রত্যাখ্যান করা। তা না করে ইন্টারপোল ও অন্যান্য সার্ভিসের সাথে একটা জোট গঠন করে তারা, তারপর টেরোরিস্টদের বিরুদ্ধে সম্মিলিত আক্রমণ শুরু করে।

প্রকৃতি চিরকালই দুর্বলের ওপর বিরূপ। মানুষ প্রকৃতির সন্তান, কাজেই তার ভেতরও এই বিশেষ স্বভাবটি বিদ্যমান। টেরোরিস্টরা উপলব্ধি করল, এই বিপদ থেকে মুক্তি পেতে হলে ভীতিকর, রোমহর্ষক একটা দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হবে। জোটের সবচেয়ে দুর্বল সদস্য ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসকে বেছে নিল তারা। হঠাৎ করে রাতারাতি শুরু হলো পাল্টা আক্রমণ। ইউরোপ জুড়ে শুধু বি.এস.এস. শাখা অফিস আর এজেন্টদের ওপর চোরাগুপ্তা হামলা চালিয়ে এক হপ্তার মধ্যে সত্যিসত্যি রোমহর্ষক একটা দৃষ্টান্ত স্থাপন করল তারা। এই এক হপ্তায় ত্রিশ জন ব্রিটিশ এজেন্ট মারা গেল, আগুন ধরিয়ে দেয়া হলো ছ'টা শাখা অফিসে। জোটের অন্যান্য সদস্যরা অবস্থা বেগতিক দেখে কোন ঘোষণা ছাড়াই নাম প্রত্যাহার করে নিল, নিজেদের গা বাঁচানোর জন্যে কোন কোন সদস্য অভ্যন্তরীণ ঝামেলার অজুহাত তুলে কেটে পড়ল। মাঠে রয়ে গেল একা ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিস, অথচ পাল্টা আঘাত হানার ক্ষমতা অনেক আগেই হারিয়ে ফেলেছে সে। অগত্যা বাধ্য হয়ে আন্তর্জাতিক সাহায্য পাওয়ার জন্যে চেষ্টা চালাতে হলো। টাকার বিনিময়ে সাহায্য পাওয়া যাবে ধরে নিয়ে প্রথমে সি. আই. এ-র সাথে কথা বলল তারা। নানা অজুহাত তুলে সময়ক্ষেপণের পথ বেছে নিল সি.আই.এ, সাহায্য করতে না চাওয়ার আসল কারণটা প্রকাশ করল না। আসল কারণটা হলো, অনেক ইউরোপিয়ান টেরোরিস্ট গ্রুপকে নিজেদের স্বার্থে বহু বছর ধরে ব্যবহার করে আসছে সি. আই.এ, গ্রুপগুলোয় তাদের বেতনভুক অনেক লোকও রয়েছে। এরপর জার্মান ইন্টেলিজেন্স-এর সাথে চুক্তি করতে চাইল ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ। জার্মানরা

ব্রিটিশদের বিপদ বুঝতে পেরে সাহায্যের সাথে কিছু রাজনৈতিক শর্ত জুড়ে দিল, যেটা পূরণ করা ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে সম্ভব নয়। এভাবে একের পর এক ইন্টেলিজেন্স সার্ভিসগুলো যখন মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে, মরিয়া হয়ে একটা পুরস্কার ঘোষণা করল ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিস। এ যেন অনেকটা আন্তর্জাতিক টেন্ডার, যে-কেউ অংশগ্রহণ করতে পারে। গোপন সার্কুলার পাঠিয়ে বলা হলো, টেরোরিস্ট গ্রুপগুলোর আক্রমণ প্রতিহত করতে পারলে দেয়া হবেঃ প্রথমত বিশ মিলিয়ন পাউন্ড নগদ, দ্বিতীয়ত ব্রিটিশ ইন্টেলিজেন্সকে নতুন ছাঁচে গড়ে তোলার কন্ট্রাক্ট, এবং সবশেষে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে দেয়া হবে ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসের আজীবন সদস্যপদ।

কেউ সাড়া দিল না, বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স বাদে। আর কোন ইন্টেলিজেন্সের পক্ষে সাড়া দেয়া সম্ভব ছিল না, কারণ প্রায় প্রতিটি ইন্টেলিজেন্সই কোন না কোনভাবে টেরোরিস্ট গ্রুপগুলোর পৃষ্ঠপোষকতা করে আসছে। টেরোরিস্টদের সাহায্য না নিয়ে ইউরোপে এসপিওনাজ তৎপরতা চালাচ্ছে একমাত্র বি.সি.আই, কাজেই এদিক থেকে কোন বাধা ছিল না। সে-সময় লন্ডনেই উপস্থিত ছিলেন রাহাত খান, ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসের প্রস্তাব পরীক্ষা করে রানাকে তিনি বললেন, 'গো অ্যাহেড।'

তবে, ব্রিটিশ প্রস্তাব পুরোপুরি গ্রহণ করা হলো না। নগদ টাকার প্রস্তাব সরাসরি প্রত্যাখ্যান করলেন মেজর জেনারেল। জানিয়ে দিলেন, স্রেফ বন্ধুত্বের খাতিরে কাজটা হাতে নেয়া হচ্ছে। প্রস্তাবের বাকি অংশগুলো সম্পর্কে নীরবতা পালন করা হলো।

একটিমাত্র শর্তই থাকল শুধু, ইংল্যান্ডে বসবাসরত

বাংলাদেশীদের স্বার্থের প্রতি যেন বিশেষ নজর রাখা হয়। বলাই বাহুল্য, রাজি হয়ে গেল ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিস। বিপুল অ্যাসেট বিক্রি করে পুরস্কারের টাকা যোগাড় করতে হত বি.এস.এস-কে, বি.সি.আই. কর্তৃপক্ষের বদান্যতায় সে-সব আর তাদেরকে বিক্রি করতে হলো না।

রাহাত খান রানা এজেন্সিকে দায়িত্ব দিলেন। প্ল্যান-প্রোগ্রাম করে অপারেশনে ঝাঁপিয়ে পড়ল রানা এজেন্সির এজেন্টরা। রানা তার সহকর্মীদের নির্দেশ দিল, কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলতে হবে। ইউরোপিয়ান মাফিয়া গোষ্ঠী চিরকালই স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে ব্যবসা চালায়, অন্যান্য টেরোরিস্ট গ্রুপ তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী। তাছাড়া মাফিয়ার কয়েকজন ডনের সাথে ব্যক্তিগতভাবে রানার পরিচয় ও উপকার বিনিময়ের ঘটনা থাকায় তাদের সাহায্য পাওয়া সহজ হয়ে গেল। শুধু মাফিয়ারই নয়, কর্সিকানদের প্রভাবশালী কয়েকজনের সাথে যোগাযোগ, সদ্ভাব থাকায় তাদের নিঃশর্ত সাহায্য পেতেও অসুবিধে হলো না। অনেক ইউরোপিয়ান ইন্টেলিজেন্স কৃতজ্ঞ ও ঋণী বন্ধু রয়েছে রানার, বিপদের সময় তারাও রানার অনুরোধে সাড়া দিল। হঠাৎ এক সকালে ইউরোপিয়ান টেরোরিস্টরা দেখল, তাদের প্রায় সব ক'টা গোপন আস্তানায় হানা দিয়ে জানমালের বিপুল ক্ষতি করছে রানা। এজেন্সির এজেন্টরা, তাদেরকে সাহায্য করছে বিভিন্ন ইন্টেলিজেন্স, কর্সিকান আর মাফিয়ারা। আটচল্লিশ ঘণ্টা ধরে চলল দাঙ্গা, লুটতরাজ, হত্যা আর অগ্নিসংযোগের ঘটনা। বাকি ইতিহাস খুবই সহজ—নতজানু হয়ে আপোষের প্রস্তাব দিল টেরোরিস্টরা।

গোটা অভিযানের নেতৃত্ব ছিল রানার হাতে। ইউরোপ জুড়ে দিন কতক ঠিক কি ঘটেছে তার কোন রেকর্ড রাখা হয়নি। মৌমাছি যেমন এক ফুল থেকে আরেক ফুলে উড়ে বেড়ায়, রানা তেমনি এক দেশ থেকে আরেক দেশে ঘুরে বেড়িয়েছে–মধু খাওয়ার লোভে নয়, মোক্ষম জায়গায় হুল ফোটানোর মানসে। অন্তত ওর কর্মকাণ্ড দেখে সংশ্লিষ্ট সবার তাই মনে হয়েছে। প্রয়োজনে রানা যে কতখানি নির্মম হতে পারে, এই ঘটনা তার প্রমাণ। দয়ামায়াহীন পাষাণে পরিণত হয়েছিল মানুষটা। তবে, তার আগে, প্রথমেই, টেরোরিস্টদের হাত গুটিয়ে নেয়ার একটা প্রস্তাব দিয়েছিল রানা। প্রস্তাবটা প্রত্যাখ্যান হওয়ার পরই কেবল আক্রমণাত্মক ভূমিকায় নামে ও।

অভিযান সফল হবার পর ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ আরেকবার প্রতিশ্রুতি দিলেন, ইংল্যান্ড প্রবাসী বাংলাদেশীদের স্বার্থের দিকে এখন থেকে অবশ্যই বিশেষ সুদৃষ্টি দেয়া হবে। এরপর শুরু হলো ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসের তরফ থেকে বি.সি.আই. চীফ রাহাত খানকে নানান কিছু দিয়ে খুশি করার প্রচেষ্টা। কিন্তু সে-সব সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করলেন রাহাত খান। তবে, ওদের একটা আবেদনে সাড়া দিতে হলো তাঁকে। তিন বছরের জন্যে পার্ট টাইম উপদেষ্টা হিসেবে মাসুদ রানাকে চাইল ওরা। বি.এস.এস-কে নতুন করে গড়ে তোলার কাজ শুরু করা হয়েছে, এই সময় রানার সাহায্য ও সহযোগিতা তাদের একান্তভাবে দরকার।

রাহাত খানের সম্মতি পাওয়া মাত্র ব্রিটিশ নাগরিকত্ব দেয়া হলো রানাকে। ছ'মাসের মধ্যেই ওকে প্রস্তাব দেয়া হলো সেনাবাহিনীর সম্মানজনক এই বিশেষ ট্রেনিং কোর্স করার।

এবার ব্রিটিশ সেনাবাহিনী ট্রেনিং ক্যাম্প খুলেছে হেরিফোর্ডে। শুধু বি.এস.এস. নয়, অন্যান্য আরও অনেক সংস্থা থেকে প্রচুর লোকজন অংশগ্রহণ করছে ট্রেনিঙে। সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী আর বিমানবাহিনীর লোক তো আছেই। তবে বিদেশী একমাত্র রানাই সুযোগটা পেয়েছে। ট্রেনারদের সম্পর্কে কাউকে কিছু জানানো হয় না, তবে ধারণা করা যায় তারা সবাই সামরিক বাহিনীর লোক। বিভিন্ন গ্রুপে ভাগ করে ট্রেনিং দেয়া হয় এখানে, তবে একটা গ্রুপ অন্য একটা গ্রুপ সম্পর্কে কোন তথ্যই জানতে পারে না।

ভোর চারটেয় ঘুম থেকে তোলা হয় রানাকে, পাঁচটার মধ্যে একটা ট্রাকে উঠতে হয়। নতুন কনের গায়ে যেমন গা ভরা গহনা থাকে, ওর সাথে থাকে গা ভর্তি কমব্যাট গিয়ার। পিঠে ঝোলে মস্ত একটা ব্যাগ, অন্যান্য ইকুইপমেন্ট শরীরের বিভিন্ন অংশে সেঁটে বা ঝুলে থাকে, এক হাতে ধরা থাকে একটা রাইফেল।

প্রতিদিন, আরও সাতজন পরীক্ষার্থী অফিসারের সাথে, ট্রাকের পিছন থেকে বনভূমি ঢাকা দুর্গম পাহাড়ী এলাকায় নামিয়ে দেয়া হয় ওকে। এক সাথে নামলেও, প্রত্যেককে রওনা হতে হয় একা, পিছন থেকে চিৎকার করে জানিয়ে দেয়া হয় ম্যাপ রেফারেন্স। রওনা হবার আগের রাতে ওদেরকে পরদিনের কর্মসূচী সম্পর্কে জানানো হয়।

কখনও হয়তো ওই ম্যাপ রেফারেন্সের সরল অর্থ দাঁড়ায়, ঘড়ির সাথে পাল্লা দিয়ে জিততে হবে ওকে, নির্দিষ্ট একটা গন্তব্যে বেঁধে দেয় সময়ের ভেতর পৌঁছুতে হবে। আবার কখনও বা নির্দেশ থাকে, পাহাড় আর জঙ্গলে সতর্ক অবস্থায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে স্পটার অফিসাররা, তাদের চোখকে ফাঁকি দিতে হবে,

এক্ষেত্রেও বেঁধে দেয়া সময়ের ভেতর নির্দিষ্ট গন্তব্যে পৌঁছুতে হবে ওকে। ধরা পড়লে অবমাননাকর ও যন্ত্রণাদায়ক ইন্টারোগেশনের শিকার হতে হয়।

দুটো পরীক্ষায় ধরা পড়েনি রানা, তবে দু'বার বেঁধে দেয়া সময়ের ভেতর গন্তব্যে পৌঁছুতে ব্যর্থ হয়েছে । দুটো ক্ষেত্রেই, সেদিনের চতুর্থ ম্যাপ রেফারেন্স পাবার পর ব্যর্থ হয় ও। এ-ধরনের ট্রেনিঙে প্রথমবার জানানো গন্তব্যে পৌঁছুতে পারলেও কদাচ অপারেশন-এর সমাপ্তি ঘটে। 'সারভাইভাল' কোর্স আরও বেশি কিছু দাবি করে–দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থবার ম্যাপ রেফারেন্সে পৌঁছুতে তো হবেই, এগোবার পথে লুকিয়ে রাখা টার্গেট সনাক্ত করতে হবে, 'খুন' করতে হবে সব ক'টাকে, অথবা ওকে না জানিয়ে লুকিয়ে রাখা অসম্ভব ভারী একটা বোঝা বের করতে হবে খুঁজে।

রাতে ফিরে আসতে হয় ট্রাকের কাছে, ক্লাস বসার আগে পরিষ্কার করতে হয় ইকুইপমেন্ট আর অস্ত্রগুলো, ক্লাসে বসে আত্মসমালোচনায় অংশগ্রহণ করতে হয়, পরদিন ভোরের জন্যে গ্রহণ করতে হয় পরবর্তী নির্দেশ।

আজ, দশম দিনে, ট্রেনিং পিরিয়ডের সবচেয়ে কঠিন পরীক্ষাটা সবেমাত্র শেষ করে ফিরেছে রানা। পঁয়তাল্লিশ মাইল ছুটতে হয়েছে ওকে, সময় দেয়া ছিল পনেরো ঘণ্টা, সাথে বোঝা ছিল পঞ্চাশ পাউন্ড, বারো পাউন্ড ইকুইপমেন্ট আর আঠারো পাউন্ডের রাইফেলটা বাদে। রাইফেলটার সাথে কোন স্ট্রিং না থাকায় কাঁধে ঝোলাবার উপায় ছিল না।

পাহাড়ের ওপার থেকে শুরু হয় মার্চ, গভীর একটা গিরিখাদ

বেয়ে পাহাড়ের মাথায় উঠে আবার নামতে শুরু করে রানা। হেলিকপ্টার নিয়ে ওর ওপর নজর রাখছিল দু'জন ট্রেনার, ওর ভুল-ভ্রান্তি নোট করছিল তারা। কোন ম্যাপ রেফারেন্স দেয়া হয়নি, সবচেয়ে সরল পথ ধরে ফিরে আসতে হবে ট্রাকের কাছে। এই অপারেশনে সাফল্য নয়, শুধু অংশগ্রহণ করার যোগ্যতা অর্জন করতে পারলেই ট্রেনারদের কাছে বিশেষ সম্মান পাওয়া যায়। ট্রেনাররা অপারেশনের নাম দিয়েছে, দ্য রাইট বাস্টার্ড।

ট্রাকের কাছে ফিরে এসে ফলাফল শোনার মত মনোদৈহিক অবস্থা কারও থাকে না, রানারও নেই। এতই ক্লান্ত আর বিধ্বস্ত লাগছে নিজেকে যে পুরো নম্বর পেয়ে পাস করা বা গোল্লা পেয়ে ফেল করা ওর কাছে যেন সমান কথা। ট্রাকে চড়ে ক্যাম্পে ফিরতে চায় ও, শাওয়ার সেরে খেতে চায়, তারপর চব্বিশ ঘণ্টা বিরতিহীন ঘুম দিয়ে রিপোর্ট করার জন্যে লন্ডনে ফিরতে চায়। কিন্তু বিধি বাম, তা হবার নয়। ব্যাপারটা রানা আঁচ করতে পারল পার্ক করা ট্রাকের পিছন থেকে অ্যাডজুট্যান্টকে বেরিয়ে আসতে দেখে।

'আপনার কমান্ডার ফোন করেছিলেন,' বলল অ্যাডজুট্যান্ট। পাথরে খোদাই করা নির্দয় জল্লাদের চেহারা তার, প্রকাণ্ডদেহী। 'বুলেটের মত ছুটে যেতে হবে,' একটু বিরতি নিয়ে বলল, 'লন্ডনে।'

মনে মনে প্রমাদ গুণল রানা, ভাবল, তবে কি অপারেশন এখনও শেষ হয়নি, ম্যাপ রেফারেন্স দেয়া হচ্ছে তাকে? 'আপনি ঠাট্টা করছেন, অ্যাডজুট্যান্ট?' নিঃশব্দে হাসার চেষ্টা করল রানা।

'দুঃখিত।' হাসল না অ্যাডজুট্যান্ট। 'দিস ইজ ফর রিয়েল।

সম্ভবত আপনাদের কোন সমস্যা হয়েছে। ক্যাম্প পর্যন্ত আপনাকে লিফট দেব আমি।'

এতক্ষণে ট্রাকের পিছনে অ্যাডজুট্যান্টের গাড়িটা দেখতে পেল রানা, উপলব্ধি করল, সচরাচর রিফ্রেশার কোর্স উপলক্ষ্যে যে নির্দয় কৌশল খাটানো হয় এটা সত্যি সেরকম কিছু নয়।

ক্যাম্পে ফেরার পথে অ্যাডজুট্যান্ট একটা পরামর্শ দিল রানাকে। রানার মনে হলো, পরামর্শ দেয়ার ভঙ্গিটা একটু যেন উপদেশ দেয়ার মত। যে লোক সহনশীলতার পরীক্ষায় সবেমাত্র দীর্ঘ পদযাত্রা শেষ করেছে তার পক্ষে হেরিফোর্ড থেকে লন্ডন গাড়ি চালিয়ে যাওয়া বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। 'সার্জেন্ট বিল রেম্যান-এর হাতে তেমন কোন কাজ নেই। খুব ভাল ড্রাইভার। দ্রুত, বহাল তবিয়তে পৌঁছে দিতে পারবে আপনাকে।'

তর্ক করার মত শক্তি নেই রানার। 'আপনি যা বলেন।' কাঁধ ঝাঁকাল ও। 'যাবার সময় আমার গাড়ি চালাল, কিন্তু ফিরতে হবে ট্রেনে বা বাসে করে।'

'আপনি আসলে তার একটা উপকার করছেন। আজ রাত থেকেই তার ছুটি শুরু হচ্ছে, লন্ডনে ফিরতে চায় সে।'

ক্যাম্পে, নিজের কোয়ার্টারে, শাওয়ার সারল রানা। সুটকেসের গোপন কমপার্টমেন্ট থেকে ব্যক্তিগত হ্যান্ডগান নাইন এমএম এএসপিটা বের করল। কাপড় বদলে স্ল্যাকস আর লেদার মোকাসিন, শার্ট আর সিল্ক জ্যাকেট পরল। এরপর ক্যাম্পের ইকুইপমেন্টগুলো স্টোরে জমা দিল ও, সংগ্রহ করল নিজের ব্যাগ, সোজা চলে এল বেন্টলি মুলসেন টারবোর কাছে। বি.এস.এস-এর জাদুকর টেকনিশিয়ানরা কারিগরি ফলিয়ে গাড়িটাকে

রূপকথার পক্ষখীরাজের সমপর্যায়ে উন্নীত করেছে।

সার্জেন্ট বিল রেম্যান ওর জন্যে অপেক্ষা করছে। সামরিক বাহিনীর সদস্য, সাদা কাপড়ে। দীর্ঘদেহী লোক, কাঁধদুটো ভারী আর চওড়া, প্রায় গুণ্ডার মত চেহারা। 'আপনি রেডি, বস্?' কর্কশ স্বরে জানতে চাইল সে।

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'ব্যাক সীটে আমি যদি শুয়ে থাকি, তুমি কিছু মনে করবে, রেম্যান? কি জানো, আমি আর আমার মধ্যে নেই।'

নিঃশব্দে হাসল সার্জেন্ট। 'ইট'স আ সোয়াইন, দি এনডিউর‍্যান্স মার্চ। আমি নিজেও ওটাকে ঘৃণা করি। ঘুমান, বস্। লন্ডনে পৌঁছে আপনাকে আমি জাগিয়ে দেব।'

স্টার্ট দিয়ে গাড়ি ছেড়ে দিল বিল রেম্যান। প্রধান সড়কে উঠে এল বেন্টলি। চেষ্টা করতে হলো না, সীটের ওপর কাত হয়ে চোখ বুজতেই ঘুমিয়ে পড়ল রানা। কতক্ষণ পেরিয়েছে কোন ধারণা নেই, সার্জেন্টের কর্কশ হাঁকডাকে ঘুম ভেঙে গেল ওর।

'বস্? বস্, শুনছেন?'

অন্ধকার জগৎ থেকে ফিরে আসছে রানা, চোখ খুলতে ইচ্ছে করছে না। প্রথমে ভাবল, ওরা বোধ হয় লন্ডনে পৌঁছে গেছে। 'কি...কোথায়...?'

'আপনি জেগে আছেন, বস্?' চিৎকার করে জিজ্ঞেস করল বিল রেম্যান।

'হ্যাঁ...হ্যাঁ।' মাথা নাড়ল রানা, যেন সচেতন হবার চেষ্টা করছে।

‘যাক!’ হাঁফ ছাড়ল সার্জেন্ট বিল রেম্যান।

‘কি ব্যাপার?’ ধীরে ধীরে গাড়ি, নিজের অবস্থান ইত্যাদি উপলব্ধি করতে পারছে রানা।

‘আপনার পেশা আমার জানা নেই, তাই ভাবছি, পিছনে ফেউ লাগার কোন ঘটনা আগে কখনও ঘটেছে কি, বস্?’

পুরোপুরি সচেতন হলো রানা। ‘কেন?’

‘অস্থির হবেন না, বস্। ব্যাপারটা হয়তো কিছুই না। তবে জানা দরকার আগে কখনও কেউ আপনার পিছু নিয়েছিল কি না। মানে, এ-ধরনের ঘটনা আপনি আশা করেন কিনা।’

‘মাঝে মধ্যে ঘটে।’ ব্যাক সীটে উঠে বসল রানা, সামনের দিকে ঝুঁকল, সার্জেন্টের কানের কাছে মাথা। ‘কেন?’

‘হয়তো মিথ্যে সন্দেহ করছি, তবে আমার যেন মনে হচ্ছে, আমাদেরকে স্যান্ডউইচ বানানো হয়েছে।’

‘কখন থেকে?’ নাইন এমএম এএসপি-র স্পর্শ নিল রানা।

‘সম্ভবত হেরিফোর্ড থেকেই।’

‘কোথায় রয়েছি আমরা?’

‘এইমাত্র এম-ফোর ছেড়ে এম-ফাইভে পড়েছি। ব্রিস্টল-এর উত্তর-পশ্চিমে।’

‘কি ঘটেছে?’

‘হেরিফোর্ডে প্রথমে আমি একটা সাব দেখতে পাই। আ নাইন হানড্রেড টার্বো। বিশেষ গুরুত্ব দিইনি, কিন্তু কোনমতে পিছু ছাড়ল না। তারপর হালকা রঙের একটা বিএমডব্লিউ দেখলাম, সাবের জায়গায়। গ্লাউস্টার পেরিয়ে আসছি, এই সময় আবার সাবটাকে দেখতে পেলাম, আমাদের সামনে। এখন আমাদের

পিছনে রয়েছে সেটা—দুটো গাড়ির পিছনে। সামনে, অনেকটা দূরে রয়েছে বিএমডব্লিউ।'

'কাকতালীয় ব্যাপার?' ধারণা পেতে চাইল রানা।

'তা-ও ভেবেছি। স্পীড কমিয়ে বিএমডব্লিউকে ওভারটেক করার সুযোগ দিয়েছি, একই সুযোগ দিয়েছি সাবকে, ড্রাইভাররা নেয়নি। এমন কি হাইওয়ে ছেড়ে খানিক পর আবার ফিরে এসেও অবস্থার কোন পরিবর্তন দেখিনি। তাছাড়া...'

'বলো, তাছাড়া?'

'তাহলে বলেই ফেলি,' ভারী গলায় বলল সার্জেন্ট। 'এখন আমার সন্দেহ হচ্ছে, ব্যাপারটা বক্স, বস্। স্যান্ডউইচ নয়।'

বক্স মানে সামনে পিছনে আর দু'পাশে একটা করে গাড়ি। 'তারমানে?'

'আরও দুটো গাড়ি রয়েছে, বস্। দু'পাশের রোড ধরে আসছে, মাঝে মধ্যে দেখা দেয়। একটা নীল অডি, আরেকটা ছোট্ট লাল লোটাস এসপ্রী। ওরা প্রফেশন্যাল, বস্। সব ক'জন ওস্তাদ ড্রাইভার।'

'তুমি নিশ্চিত, কাকতালীয় ব্যাপার নয়?' বিড়বিড় করল রানা।

'ফাঁকি দেবার সব রকম চেষ্টা করেছি, তারপরও রয়েছে ওগুলো। আপনি কি বলেন?'

সাথে সাথে জবাব দিল না রানা। মোবাইল সার্ভেইল্যান্স 'বক্স' পরীক্ষিত ও কার্যকরী টেকনিক—একটা গাড়ি থাকবে পিছনে, একটা সামনে, বাকি দুটো ডানে ও বামে। বক্সের গাড়িগুলো পরস্পরের সাথে রেডিও যোগাযোগ রক্ষা করে। কিন্তু

কারা? ওর ওপর নজর রাখার কি কারণ? ঠিক এই সময়টাতেই বা কেন? তবে কি মারভিন লংফেলো ওর ওপর কোন রকম পরীক্ষা চালাচ্ছেন? উঁহুঁ, তা মনে হয় না।

দক্ষ হাতে চমৎকার গাড়ি চালাচ্ছে সার্জেন্ট বিল রেম্যান। কয়েকটা লেনে বিভক্ত রাস্তাটা, যখন যেমন সুবিধে এক লেন থেকে আরেক লেনে চলে যাচ্ছে সে, যানবাহনের মাঝখানে বেন্টলিটা তার হাতে যেন নাচছে।

'এসো, আরেকবার চেষ্টা করে দেখা যাক ফাঁকি দেয়া যায় কিনা,' বলল রানা। 'নেক্সট এগজিট কত?'

'সতেরো, বস্। ডানে চিপেনহ্যাম, মাম্স্বারি বামে।'

'এদিকের রাস্তাঘাট চেনো?'

'চিপেনহ্যামের দিকটা ভাল করে চিনি। গ্রামের ভেতর দিয়ে অনেক লেন চলে গেছে। তবে সরু। গাড়ি চালানো খুব কঠিন।'

'তাহলে দৌড় খাটাও ব্যাটাদের,' বলল রানা। 'সম্ভব হলে একটাকে থামাব আমরা।'

মটরওয়েতে প্রচুর যানবাহন, তবু পিছন দিকে তাকিয়ে গ্রে কালার সাবের আকৃতিটা চিনতে পারল রানা, অন্যান্য গাড়ির আলোয় আলোকিত হয়ে আছে। একই অবস্থানে রয়েছে ওটা, ওদের কাছ থেকে দুটো গাড়ি পিছনে। 'রেম্যান, তোমার কাছে কিছু আছে?'

'থাকলে আপনি বুঝতে পারতেন। আপনার সাথে, বস্?'

'আছে। ম্যাপ কম্পার্টমেন্টে একটা স্পেয়ারও পাবে তুমি।' সীটের ওপর দিয়ে চাবিটা বাড়িয়ে দিল রানা। 'একটা রুগার পি এইটিফাইভ।'

কয়েক সেকেন্ড পর হালকা সুরে জিজ্ঞেস করল সার্জেন্ট, ‘অস্ত্রগুলো কি, বস্, বৈধ?’

‘সত্যি জানি না,’ বলল রানা, এখনও সম্ভাবনা নিয়ে চিন্তা করছে ও। ও যে হেরিফোর্ডে ছিল, তথ্যটা বি.এস.এস. হেডকোয়ার্টারের মাত্র তিনজন মানুষ জানে–মারভিন লংফেলো, জন মিচেল আর এলিজাবেথ। ওর বিরুদ্ধে শত্রুতা বা বিদ্বেষপ্রসূত কোন উদ্দেশ্য নিয়ে যদি নজর রাখা হয়ে থাকে, লোকগুলোর তথ্য পাবার একমাত্র উৎস হতে পারে বি.এস.এস. হেডকোয়ার্টার; অথচ ওখানে যারা আছে তারা সবাই ওর পরীক্ষিত বন্ধু ও শুভানুধ্যায়ী, এ-ধরনের কোন তথ্য ফাঁস করার চেয়ে মৃত্যুবরণ করাটাকে শ্রেয় জ্ঞান করবে।

সামনের জংশনটা এগিয়ে আসছে। রানা দেখল, তিনটে গাড়ির আগে বিএমডব্লিউটা রয়েছে। দ্রুতবেগে বাঁকটাকে পাশ কাটাল। একেবারে শেষ মুহূর্তে সিগন্যাল দিল সার্জেন্ট রেম্যান, স্পীড বাড়িয়ে দিয়ে উঠে পড়ল এগজিট র‍্যাম্পে, গোলাকার রাউন্ড অ্যাবাউট ধরে চক্কর দিচ্ছে, শ্লথগতি দুটো ছোট গাড়িকে ওভারটেক করল, তারপর স্যাঁৎ করে ঢুকে পড়ল চিপেনহ্যাম রোডে। মাইলখানেক এগিয়ে মেইন হাইওয়ে ত্যাগ করল সে। পাকা হলেও এদিকের রাস্তা সরু আর অন্ধকার, গতি সামান্য কমিয়ে আনল সার্জেন্ট। শক্তিশালী হেডলাইটের আলোয় দু’পাশে গাছপালা আর ঝোপঝাড় দেখা গেল।

‘খসাতে পেরেছি, বস্?’ তীক্ষ্ণ একটা বাঁক নেয়ার সময় জিজ্ঞেস করল সার্জেন্ট।

‘বলতে পারছি না,’ ঘাড় ফিরিয়ে অন্ধকার পিছন দিকে

তাকাল রানা। ‘কোন আলো দেখছি না। তাতে অবশ্য কিছু প্রমাণ হয় না।’ পিছনের লোকটা যদি সে হত, গাড়ির সমস্ত আলো নিভিয়ে পিছু নিত, বিশেষ করে গ্রাম্য পথে, নির্ভর করত ভাগ্য আর ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের ওপর, কিংবা চোখে ব্যবহার করত নাইট গগলস, নিরাপদে টার্গেটের পিছনে থাকার জন্যে। পিছনে কোন আলো না থাকলেও, উদ্বেগের ঠাণ্ডা একটা অনুভূতি ওকে ছাড়ল না।

এইভাবে ছয় কি সাত মাইল পেরিয়ে এল ওরা, পিছনে কেউ লেগে থাকলে এতক্ষণে কিছু না কিছু দেখতে পেত। ছোট একটা গ্রামের ভেতর দিয়ে এগোচ্ছে গাড়ি। রাস্তার কিনারায় দাঁড়িয়ে থাকা হতভম্ব পথিকদের লালচে কয়েকটা মুখ দেখতে পেল রানা, খানিক পর পর একটা দুটো করে। চোখের পাতা ফেলার আগেই অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। একটা পাব দেখতে পেল। তারপর একটা চার্চ। ব্যাক সীটে কাত হয়ে পড়ল রানা, ডান দিকে বাঁক নিল বেন্টলি। বাঁক নেয়ার পর রাস্তাটা দেখা গেল ফিতের মত সরল, ঢাল বেয়ে নিচের দিকে নেমে গেছে। রাস্তা ধরে তীরবেগে নামছে ওরা। অকস্মাৎ অশ্রাব্য একটা গালি দিল সার্জেন্ট। চাপ দিল ব্রেকে।

সামনে একটা নয়, একজোড়া হেডলাইট—ওদের দিকে আসছে না, দু’পাশ থেকে পরস্পরের দিকে এগোচ্ছে।

প্রকাণ্ড ঝাঁকি আর বিপুল গতির মধ্যে প্রায় দিক্‌ভ্রান্ত হয়ে পড়ল রানা, তবু চট করে কয়েকটা ব্যাপার উপলব্ধি করতে পারল। বিশ গজ দূরে একটা ক্রসরোড, ক্রসরোডের ডান ও বাম দিক থেকে পরস্পরের দিকে ছুটে আসছে দু’জোড়া হেডলাইট।

ব্যাপারটা ভাল করে উপলব্ধি করার আগেই বিশ গজ দূরত্ব আর প্রায় কোন দূরত্বই থাকল না। দু'জোড়া হেডলাইটের পিছনে দুটো গাড়িকে দেখা গেল। বোতামে চাপ দিয়ে বেন্টলির হেডলাইট জ্বালল সার্জেন্ট, তীব্র আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠল সামনের গাড়ি দুটো, পরস্পরের দিকে এগিয়ে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল, দুটো ধাতব নাক পরস্পরের সাথে প্রায় ঠেকে গেছে, রোডব্লকের আদর্শ ভঙ্গিতে—একটা লাল লোটাস এসপ্রী, অপরটা নীল অডি।

এখনও ব্রেক করছে সার্জেন্ট, হুইল ঘুরিয়ে বাম দিকে সরে যাবার চেষ্টা করছে, প্রতি মুহূর্তে আকারে বড় হয়ে উইন্ডস্ক্রীন ঢেকে ফেলছে গাড়ি দুটো। রাস্তা ছেড়ে ঘাসের ওপর পড়ল বেন্টলির চাকা, সামান্য ঝাঁকি খেলো, পরমুহূর্তে সামনের জোড়া গাড়ি দুটোর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার উপক্রম করল।

ব্যাক সীটে নিজের জায়গা থেকে রানা দেখল, রোডব্লক আর বাম দিকের নব্বুই ডিগ্রী বাঁকের মাঝখানে জায়গা অত্যন্ত কম, তবে বিরাট গাড়িটাকে নিয়ন্ত্রণ করল সার্জেন্ট একজন র‍্যালি ড্রাইভারের মত, প্রয়োজনে ঝুঁকে পড়ছে হ্যান্ডব্রেকের দিকে, পা দুটো নাচানাচি করছে ফুটব্রেক আর অ্যাকসিলারেটরের ওপর।

তীব্র কর্কশ প্রতিবাদ করল বেন্টলির টায়ার, হড়কাতে শুরু করল চাকা, একদিকে কাত হয়ে পড়ল গাড়ি, তারপর সিধে হলো, গতি বাড়ছে, বাম দিকের ঝোপগুলোকে ছুঁয়ে দিল, তবে এসপ্রীর বুটের সাথে ধাক্কা খেলো না সম্ভবত এক ইঞ্চির জন্যে।

বাঁক নিয়ে নতুন রাস্তায় পড়ল ওরা, মাথার ওপরটা ডালপালা দিয়ে ছাওয়া। মনে হলো, ওরা যেন একটা টানেলের ভেতর দিয়ে ছুটছে। রাস্তাটা এতই সরু যে চেষ্টা করলে হয়তো কোন রকমে

দুটো গাড়ি পরস্পরকে পাশ কাটাতে পারবে।

ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকাল রানা, দেখল এসপ্রীর পিছনের লাল আলো ক্রমশ ম্লান হয়ে যাচ্ছে। তবে অডির হেডলাইটের আলো উজ্জ্বল লাগল চোখে। ঝট করে মাথা নিচু করল ও। অন্ধকারে খুদে নীল আলোর ঝলক দেখা গেল কয়েকটা। বেন্টলির গুঞ্জনকে ছাপিয়ে, যতটা না শুনতে পেল তারচেয়ে বেশি অনুভব করল, ওদের চারদিকে বুলেট বৃষ্টি হচ্ছে।

'ক্রিস্ট!' বিড়বিড় করল সার্জেন্ট, গতি না কমিয়ে ডান দিকে বাঁক নেয়ার জন্য হুইল ঘোরাল, দৃষ্টিসীমার বাইরে ফেলে এল রোডব্লকের গাড়ি দুটোকে। 'আসলে আপনার পেশাটা কি বলুন তো, বস্? ন্যাশনাল হেলথ সার্ভিসের গিনিপিগ?'

'অডিটা আমাদের পিছু নেবে, রেম্যান। সময় থাকতে এগিয়ে থাকো।'

'চিন্তা করবেন না, বস্।'

খোলা জায়গায় বেরিয়ে এল বেন্টলি, যে-কোন মুহূর্তে পিছনে আলো দেখতে পাবে বলে আশঙ্কা করছে রানা। হাতে বেরিয়ে এসেছে এএসপি, অপর হাতটা জানালার বোতামে, অকস্মাৎ অন্ধকার থেকে লাফ দিলে শত্রুর নিস্তার নেই। 'বলতে পারো কোথায় রয়েছি আমরা?' অন্ধকারে চোখ জ্বালার চেষ্টা করল ও, গাড়িতে নাইট-ফাইন্ডার গ্লাস না থাকায় তিরস্কার করল নিজেকে।

'লন্ডনে পৌঁছানোটা যদি আপনার উদ্বেগ হয়, ঝেড়ে ফেলুন, বস্।' হাতের কাজে গভীর মনোযোগ থাকায় গলার আওয়াজ টান টান শোনাল। 'গ্রামের সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য উপভোগ করুন। মটরওয়ে থেকে যতটা সম্ভব দূরে থাকব আমি।'

'গুড...হেল।' বোতামে চাপ দিয়ে পিছনের অফসাইড উইন্ডো খুলে ফেলল রানা। হেডলাইটের চোখ ধাঁধানো আলো নিয়ে সাবটা যেন আকাশ থেকে পড়ল, ঠিক ওদের পিছনে। 'স্পীড বাড়াও!' হাঁক ছাড়ল ও, দরজার গায়ে সেঁটে আছে শরীরটা, এএসপি তুলল জানালার কিনারায়, ঠাণ্ডা বাতাসের ধাক্কা অনুভব করল মুখে আর হাতে।

এখনও পিছনে লেগে রয়েছে সাব, পর পর দুটো গুলি করল ও–ক্ষিপ্রতার সাথে, নিচের দিকে–আশা, গাড়ির একটা চাকা ফুটো করে দিতে পারবে। সরু রাস্তা, ফাঁকা হলেও ঘণ্টায় আশি মাইল স্পীডই অনেক বেশি, বাধ্য হয়ে বিপজ্জনক নব্বুইয়ে উঠে যাচ্ছে সার্জেন্ট। ব্যাক সীটে ঘন ঘন এদিক ওদিক কাত হয়ে পড়ছে রানা, এখনও দরজা ধরে ঝুলে আছে ও, লক্ষ্যবস্তুর ওপর লক্ষ্য স্থির করার চেষ্টা করছে, তীব্র আলোর ঝলকে কুঁচকে আছে চোখ দুটো।

আবার গুলি করল রানা, সাবের একটা হেডলাইট নিভে গেল। গুলিটা মাত্র করেছে, অকস্মাৎ একদিকে কাত হয়ে পড়ল বেন্টলি, যেন গাড়ির নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছে ড্রাইভার–একবার ডান দিকে, পরমুহূর্তে বাম দিকে ছুটল ওরা। এভাবে ঘন ঘন এদিক-ওদিক করায়, পিছনের সাবকে অন্তত দু'বার প্রায় আড়াআড়ি টার্গেট হিসেবে দেখতে পেল রানা। প্রথমবারই সুযোগটা কাজে লাগাতে চেষ্টা করল ও, এত দ্রুত গুলি করল যে বিস্ফোরণের দুটো শব্দকে আলাদাভাবে প্রায় চেনা গেল না। সাবের উইন্ডস্ক্রীনটাকে মাকড়সার জাল হয়ে যেতে দেখল ও। মনে হলো, অস্পষ্ট একটা আর্তনাদও যেন শুনতে পেয়েছে। তবে

বাতাসের গর্জনও হতে পারে।

বেন্টলির পিছনের বাম্পারে যেন ঝুলে থাকল সাব, তারপর পিছিয়ে পড়ল, পিছোবার সময় বাঁ দিকে সরে গিয়ে ভয়ানক একটা ঝাঁকি খেলো। রাস্তার কিনারায় উঁচু হয়ে থাকা পাড়ে উঠতে শুরু করল সাব, দৃশ্যটা পরিষ্কার ধরা পড়ল রানার চোখে। পাড়ের কিনারায় এক সেকেন্ড যেন স্থিরভাবে ঝুলে থাকল ওটা, তারপর অদৃশ্য হয়ে গেল। এক মুহূর্ত পর লালচে শিখার খানিকটা ডগা দেখা গেল। পতনের বা সংঘর্ষের শব্দটা এতই অস্পষ্ট, কেউ যেন তুড়ি মারল।

'যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মটরওয়েতে উঠে পড়া দরকার,' বলল রানা। 'আগুন দেখে ছুটে আসবে লোকজন, পুলিসে খবর দেবে। ভাল হয় এই রাস্তায় যদি বেন্টলিটাকে কেউ না দেখে। পুলিস জানতে পারলে ঘটনার সাথে আমাদের সম্পর্ক আছে বলে সন্দেহ করবে।'

'কোন্ ঘটনা?' ড্রাইভিং মিররে অস্পষ্টভাবে সার্জেন্টের ক্ষীণ হাসি দেখতে পেল রানা।

খানিক পর সার্জেন্টকে জিজ্ঞেস করল ও, বাকি গাড়িগুলোর নম্বর জানার সুযোগ হয়েছে কিনা। এক এক করে চারটে গাড়ির নম্বর বলে গেল বিল রেম্যান, কোন্টার কি রঙ তা-ও জানিয়ে দিল। সবশেষে জিজ্ঞেস করল রানা, 'তুমি নিশ্চয়ই লক্ষ করোনি কি পরে ছিল ড্রাইভাররা?' ওর ঠোঁটে গম্ভীর হাসি লেগে রয়েছে।

'অত সব লক্ষ করার সময় পাইনি, বস্।' হাসছে সার্জেন্টও, জানে রানা। কিন্তু গাড়ির রঙ বা নম্বর জানলেও আসল প্রশ্নের উত্তর এখনও পাওয়া গেল না—ওরা কারা, পিছু নেয়ার উদ্দেশ্য কি

ছিল?

প্রশ্নগুলো নিয়ে তখনও মাথা ঘামাচ্ছে রানা, মটরওয়েতে উঠে এল বেন্টলি। সার্জেন্টের সাথে জায়গা বদল করল ও। লন্ডন পর্যন্ত আর কিছু ঘটল না।

বুট থেকে নিজের সুটকেস আর ব্যাগ বের করল বিল রেম্যান, রানার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল, তার ভাষায়, 'ইন্টারেস্টিং একটা জার্নি উপহার দেয়ার জন্যে।'

'ড্রাইভিঙে তোমার হাত সত্যি খুব ভাল,' প্রশংসা করল রানা।

'আপনি আমার ফোন নম্বরটা রাখবেন, বস্? যদি কোন দরকার পড়ে?'

হুইলের ওপর একটা হাত রেখে মাথা ঝাঁকাল রানা, সার্জেন্টের বলা সংখ্যাগুলো মুখস্থ করে নিল।

'আপনার কোন কাজে লাগতে পারলে নিজেকে ধন্য মনে করব, বস্।'

বিদায় নিয়ে গাড়ি ছেড়ে দিল রানা, রিজেন্টস পার্কের দিকে যাচ্ছে।

চার

চেয়ার ছেড়ে রানার সাথে করমর্দন করলেন মারভিন লংফেলো। 'আশা করেছিলাম আরও আগে পৌঁছুবে তুমি,' পুলিস সুপার জেফারসনের সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়ে রানাকে বললেন তিনি।

রানার সাথে করমর্দনের জন্যে হাতটা বাড়িয়ে দিলেন পুলিস সুপার।

'ট্রাফিক, মি. লংফেলো,' বলল রানা। পুলিস সুপারের হাতটা ইতস্তত ভঙ্গিতে ধরল ও, খানিকটা অপ্রস্তুত বোধ করছে। বি.এস.এস. চীফকে একা দেখতে পাবে বলে আশা করেছিল ও। পুলিস অফিসারের উপস্থিতি সম্পর্কে এলিজাবেথও ওকে সতর্ক করে দেয়নি। ব্যাপারটা কি?

ইঙ্গিতে রানাকে বসতে বললেন মারভিন লংফেলো। 'ভাল হয় ঘটনাটা যদি তুমি অফিসারের মুখ থেকে শোনো।' দু'জনের দিকেই একবার করে সরাসরি তাকালেন তিনি।

ধীরে ধীরে, প্রায় নাটকীয় ভঙ্গিতে শুরু করলেন পুলিস সুপার। প্রতিবার একটা করে তথ্য দিলেন। খুবই সতর্ক আর সন্দিগ্ধ মনে হলো তাঁকে রানার। লাশ পাবার কথা বললেন, কিন্তু তরুণীর নামটা জানালেন না। 'তার বয়স বাইশ,' বললেন তিনি। 'হাতব্যাগের ভেতর যে নোটবুকটা পাওয়া গেছে তাতে আপনার ফোন নম্বর রয়েছে।' এক সেকেন্ড বিরতি নিয়ে যোগ করলেন, 'আসলে, নোটবুকে ওটাই একমাত্র ফোন নম্বর।'

দীর্ঘ পনেরো ঘণ্টার পদযাত্রা, তারপর হেরিফোর্ড থেকে লন্ডনে আসার পথে বিড়ম্বনা, সারা শরীর টন টন করছে রানার। শরীর এত ক্লান্ত যে ঢিল দিলে এখানে বসেই ঘুমিয়ে পড়বে ও। ক্লান্ত মস্তিষ্কের একটা অংশে সেই আগের দুটো প্রশ্ন নিয়ে হিমশিম খাচ্ছে, কেন এবং কারা ওর পিছু নিয়েছিল? শুধু কি পিছু নিয়েছিল? একটুর জন্যে প্রাণে বেঁচে গেছে ওরা! রিপোর্ট করার জন্যে বি.এস.এস. চীফকে একা পাওয়া দরকার ওর। চোখ তুলে

পুলিস সুপারের দিকে তাকাল ও। 'আমার টেলিফোন নম্বর?' জিজ্ঞেস করল। 'কে...কাকে খুন করা হয়েছে?'

'খুন করা হয়েছে কিনা জানা যায়নি,' পুলিস সুপার বললেন। 'মেয়েটার নাম নাদিরা রহমান।' একা শুধু এস. বি-র অফিসার নন, মারভিন লংফেলোও রানার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করার জন্যে। অবিশ্বাসে রানা শুধু বার দুয়েক মাথা নাড়ল। 'নাদিরা রহমান, মাই গড!' বিড়বিড় করল ও, শান্তভাবে। 'বেচারি! কেন, তাকে কেন... সে কেন...?'

'আপনি তাহলে তাকে চিনতেন, মি. রানা?'

'সামান্য পরিচয় ছিল।' চেয়ারে শান্ত ভঙ্গিতে, শিরদাঁড়া খাড়া করে বসে আছে রানা। 'প্রায় দু'বছর তাকে দেখিনি। তবে গত নভেম্বরে আমাকে ফোন করেছিল সে। অদ্ভুতই বলব...'

'সামান্য বলতে আপনি ঠিক কি বোঝাতে চান, মি. রানা?' সাধারণ প্রশ্ন, তবু উচ্চারণ করার ভঙ্গিতে সন্দেহ চাপা থাকল না।

'খুবই সামান্য,' দৃঢ়তার সাথে জবাব দিল রানা, তীক্ষ্ণ ও ধারাল সুরে। 'দু'বছর আগে তার জন্মদিনে আমাকে নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল। মিস্টার ও মিসেস মোখলেসুর রহমানকে অনেক দিন থেকে চিনি আমি। আমার ধারণা, পার্টিটাকে জমজমাট করার উদ্দেশ্যে আমাকে নিমন্ত্রণ করা হয়। মনে পড়ছে, শেষ মুহূর্তে কেউ আসবে না জানিয়ে দেয়ায় তার জায়গায় আমাকে...'

'তাছাড়া, মেয়েটার সাথেও আপনার ভাল সম্পর্ক ছিল?'

বড় করে শ্বাস টানল রানা, ধরে রাখল ফুসফুসে, তারপর ধীরে ধীরে ছাড়ল। 'ভাল সম্পর্কের সংজ্ঞা কি? আমার তুলনায়

তার বয়স একটু কম, সেজন্যে তার সাথে নিজেকে আমি জড়াতে চাইনি। তবে, হ্যাঁ, আমার প্রতি...মানে দুর্বল ছিল সে।' মারভিন লংফেলোর দিকে তাকাল রানা। 'ব্যাপারটা বিব্রতকর হয়ে উঠেছিল। দু'একবার তাকে নিয়ে ডিনার খাই আমি।'

'আপনি কি তাকে...?' এস.বি. অফিসার প্রশ্নটা শেষ করলেন না।

'না। আমি তাকে...না। তাকে উৎসাহ দেয়া হয়, এমন কিছু করিনি আমি। ব্যাপারটা অত্যন্ত কঠিন ছিল। ফোন তো করতই, চিঠিও লিখত।' এক মুহূর্ত থামল রানা, নাদিরার চেহারাটা স্মরণ করল–ফর্সা, একহারা গড়ন, মায়াভরা কালো চোখ। বিশেষ করে চোখ দুটো পরিষ্কার মনে আছে ওর। বড় বড় স্বচ্ছ।

শেষ ডিনারটার কথা ধীরে ধীরে মনে পড়ল রানার। 'সব কথা জানার দরকার নেই আপনাদের। শেষ বার তাকে আমি ডিনারে নিয়ে যাই নিজের অক্ষমতা প্রকাশ করার জন্যে। তাকে বলি, আমার আশা ছেড়ে দিতে হবে, কারণ এরই মধ্যে একজনকে কথা দিয়েছি আমি...'

'শুনে কি বলল সে?'

'মন খারাপ করে আমার কথা শুনল সে। কিছু বলল না। তাকে আমি বন্ধুত্বের প্রস্তাব দিই। বলি, কখনও যদি কোন সমস্যা হয়, ডাকলেই আমাকে পাশে পাবে সে।'

বড় একটা নিঃশ্বাস ফেললেন মারভিন লংফেলো। 'মেয়েদের ব্যাপারস্যাপার ভাল বুঝি না। তবে, এধরনের কথাবার্তা ওদেরকে উৎসাহিত করে বলেই আমার ধারণা।'

শুধু ফলাফলটা প্রকাশ করল রানা, 'এরপর নাদিরা আর এ-প্রসঙ্গে কখনও আমাকে কিছু বলেনি।'

'সেই থেকে তার সাথে আপনার আর কোন যোগাযোগ হয়নি?' জানতে চাইলেন পুলিস সুপার।

'আপনাকে বললাম না, গত নভেম্বরে ফোন করেছিল সে।'

'এবং অদ্ভুত ছিল সেটা?'

'হ্যাঁ।'

'কোন্ অর্থে অদ্ভুত, মি. রানা?'

'কথাবার্তা যা বলল, মনে হলো প্রলাপ বকছে। কি একটা হাসপাতাল না ক্লিনিক থেকে ফোন করেছিল। জিজ্ঞেস করল, আমার মৃত্যুভয় আছে কিনা। স্বর্গে যাওয়ার জন্যে ত্যাগ স্বীকার করতে রাজি আছি কিনা। ধর্মীয় কথাবার্তা, বুঝতেই পারছেন।'

'কি বললেন আপনি তাকে?'

'মানে?'

'স্বর্গে যেতে চান কিনা?'

হাসল রানা। 'উত্তরটা কি দিতেই হবে? ধর্মীয় বিশ্বাস ব্যক্তিগত ব্যাপার বলেই আমার ধারণা।'

'আপনার বিশ্বাস সম্পর্কে আমি কিছু জানতে চাইছি না,' গম্ভীর সুরে বললেন পুলিস সুপার জেফারসন। 'আমি জানতে চাইছি, নাদিরা রহমানকে কি জবাব দিলেন আপনি?'

'আমি তাকে বললাম, এ-সবে আমার বিশ্বাস নেই।'

'জবাবটা কিভাবে নিল সে?'

'মনে হলো, আমার কথা শুনতে পায়নি। হড়বড় করে আবোলতাবোল কি সব বলে গেল। তারপর নামিয়ে রাখল

রিসিভার।'

'আপনি উদ্বিগ্ন হননি?'

'এখন মনে পড়ছে, হ্যাঁ। হঠাৎ করে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ায় আমার সন্দেহ হয়েছিল, কেউ তাকে বাধা দিয়েছে। কেউ হয়তো রিসিভারটা কেড়ে নিয়ে ক্রেডলে রেখে দিয়েছিল।' নিজেকে প্রশ্ন করল রানা, সন্দেহটা নিয়ে তখন কেন মাথা ঘামায়নি?

'আপনার সাথে যখন পরিচয় ছিল, দু'বছর আগে, তাকে দেখে কি মনে হত, মেয়েটা ড্রাগে আসক্ত হতে পারে?'

ঠাণ্ডা চোখে পুলিস অফিসারের দিকে তাকাল রানা। 'আজকাল তা বুঝবেন কিভাবে? নাদিরা কি...?'

'ড্রাগে আসক্ত ছিল কিনা? হ্যাঁ, ছিল। একদম নেমে যায়। হেরোইন। ঘটনার সবটুকুই জানি আমরা। তার প্রতি পরিবারের সবাই অত্যন্ত সহানুভূতিশীল ছিলেন। কিন্তু তাঁদের কোন সাহায্য নিতে রাজি হয়নি সে। অবশেষে বেচারি মেয়েটা ধর্মের দিকে ঝুঁকে পড়ল। ধর্ম মানে...হ্যাঁ, এক ধরনের ধর্মই বলতে হবে। নিজেদের ওরা সত্যদর্শী বলে, আবার কখনও সত্য সমিতির সদস্য বলে। ওদের সম্পর্কে জানেন আপনি?'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'কে জানে না? ভাল হও, আদর্শ হও—যদিও এ-সব ওদের ফাঁকা বুলি বলে সন্দেহ হয়। কারণ, নীতিবাক্য যেমন আওড়ায়, তেমনি আজেবাজে অনেক কাজও করে ওরা। মাদক বিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলার কথা বলে, বলে পবিত্র একটা সভ্যতার উন্মেষ ঘটাবে, সবাই যাতে স্বর্গে

যেতে পারে। সবচেয়ে হাস্যকর লাগে যখন স্বর্গ কেনার কথা বলে ওরা।'

রানাকে সমর্থন দিয়ে মাথা ঝাঁকাতে গিয়েও ক্ষান্ত হলেন পুলিস সুপার জেফারসন। 'বোঝা গেল, ওদের সম্পর্কে জানেন আপনি। বাইরে থেকে দেখে মনে হবে সত্য সমিতির সদস্যরা ভাল কাজ ছাড়া কিছু বোঝে না—কৌমার্য রক্ষা করো, ব্যভিচার বন্ধ করো, বিবাহবন্ধনের পবিত্রতা রক্ষা করো, অপব্যয় বন্ধ করো, দুর্নীতি নির্মূল করো, সৎ হও, ধর্মের পথে এসো, বিভেদ পরিহার করো, সত্যবাবার পথ ধরো...আরও কি কি যেন সব আছে। তবে, একটা কাজে সত্যি ওরা সফল হয়েছে।'

'কি সেটা?' জানতে চাইল রানা।

'ওরা একটা ডিটক্সিফিকেশন ইউনিট চালায়, ড্রাগ আর অ্যালকোহল অ্যাডিক্টদের চিকিৎসা করে। সবই খুব ভাল, কিন্তু একটু ভেতরে উঁকি দিন, দেখবেন কি যেন একটা গোলমাল আছে...'

'কি রকম?' প্রশ্নটা মারভিন লংফেলোর।

'ওদের ধর্মের কথাই ধরুন। ওল্ড টেস্টামেন্ট, নিউ টেস্টামেন্ট, কোরান, উপনিষদ, এরকম আরও অনেক ধর্মগ্রন্থ থেকে নিজেদের পছন্দ মত কিছু কিছু অংশ নিয়ে একটা সংকলন তৈরি করেছে ওরা, তার সাথে যোগ করেছে ওদের গুরু এম.ভি.এফ. সত্যবাবার কিছু বাণী ও উপদেশ। ধর্মীয় আচার ও রীতিও পাঁচমেশালী।

'সবই আসলে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের স্বার্থে।

নিজেদের ধর্মটাকে ওরা একটা বিপ্লব সফল করার হাতিয়ার হিসেবে দেখে। গোটা ব্যাপারটা সত্যি অপরিণত আর উদ্ভট, সন্দেহ নেই, কিন্তু তরুণ বয়সের কাঁচা মনের কাছে এ-সবের আবেদন প্রচণ্ড। বিশেষ করে ইউরোপ আমেরিকায় সত্যবাবার জনপ্রিয়তা তুঙ্গে।

'ওদের একটা শ্লোগান হলো—"আমরা স্বর্গযাত্রী। আমরা যারা স্বর্গে যাব, দুনিয়াতেও নিজেদের রাজত্ব কায়েম করব"। ওদের কথা হলো, মানুষ সবাই সমান, কাজেই স্বর্গে যাবার অধিকার সবার আছে। সবাই যাতে স্বর্গে যেতে পারে, তার জন্যে একটা রক্তাক্ত বিপ্লব ঘটাতে হবে। বিপ্লব না ঘটলে সব মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে না।

'আপনারা জানেন কি, বিশেষ করে ধনী পরিবারগুলোর অনেক ছেলেমেয়ে মোটা টাকা চাঁদা দিয়ে ওদের সমিতিতে নাম লিখিয়েছে? যারা পাপ করেছে, এখন পাপ না করার জন্যে মানসিকভাবে তৈরি, স্বর্গে ঠাঁই পাবার জন্যে তাদেরকে চাঁদা দিতে হয় চল্লিশ হাজার পাউন্ড।'

অবাক হয়ে তাকিয়ে আছেন মারভিন লংফেলো, যেন বিশ্বাস করতে পারছেন না।

'আপনি বলতে চাইছেন, নাদিরা চল্লিশ হাজার পাউন্ড চাঁদা দিয়ে স্বর্গযাত্রীদের দলে ভিড়েছিল?' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে জানতে চাইল রানা।

'হ্যাঁ, তাই। আপনার তো জানাই আছে, মোখলেসুর রহমানের একমাত্র উত্তরাধিকারী ছিল সে। মেয়ের আবদার রক্ষা করেন তিনি। তার ভাগের সমস্ত সম্পত্তি লিখে দেন তাকে। নগদ

টাকাও দেন। বংশপরম্পরায় ধনী পরিবার, চল্লিশ হাজার পাউন্ড ওদের কাছে কোন ব্যাপারই না। এরকম আরও অনেক পরিবার আছে। আগেও তার হাতে প্রয়োজনের চেয়ে অনেক বেশি টাকা-পয়সা পড়ত, ড্রাগ অ্যাডিক্ট হয়ে পড়ার সেটাই বোধহয় কারণ। অবশ্য, সত্য সমিতিতে নাম লেখাবার পর, নেশার অভিশাপ থেকে সম্পূর্ণ মুক্তি পায় মেয়েটা।'

'সেজন্যে কৃতিত্ব দাবি করছে সত্যপীর...?'

'সত্যবাবা,' ভুলটা ধরিয়ে দিলেন পুলিস সুপার। 'এম.ভি.এফ. সত্যবাবা।'

'ওই হলো। এম.ভি.এফ. সত্যবাবা...এম.ভি.এফ. মানে কি?' জানতে চাইলেন মারভিন লংফেলো।

'এম. মানে মাওলানা,' বললেন পুলিস সুপার উইলবার জেফারসন। 'ভি. মানে ভগবান। আর এফ. মানে ফাদার।'

'সব মিলিয়ে ভণ্ডামি আর ভাঁওতাবাজি,' গম গম করে উঠল বি. এস. এস. চীফের ভারী গলা। 'সবই আছে, শুধু আসল নামটা নেই।' পুলিস সুপারের দিকে সরাসরি তাকালেন তিনি। 'ঠিক আছে, এবার সমস্যাটা নিয়ে কথা বলা যাক, বিশেষ করে দুর্ভাগা মেয়েটার সাথে রানার সম্পর্ক যখন জানা গেছে। রানা, আমাদের হাতে ছোট্ট একটা সমস্যা রয়েছে।'

'সমস্যা, মি. লংফেলো?'

'একা শুধু নাদিরা নয়, লর্ড ওয়ালটন চেস্টারফিল্ডের মেয়ে ডোনা চেস্টারফিল্ডও সত্য সমিতিতে নাম লিখিয়েছে। মি. মোখলেসুর রহমান ইডিউস-এর চেয়ারম্যান, আর লর্ড ওয়ালটন

চেস্টারফিল্ড একই ফার্মের উপদেষ্টা–এই মুহূর্তে এই বিল্ডিঙে রয়েছেন ভদ্রলোক, আমাদের হিসাব-পত্র অডিট করছেন। তুমি জানো, তাঁর সাথে বহু বছরের সম্পর্ক আমার।'

'জ্বী, জানি।'

'লর্ড চেস্টারফিল্ডের মেয়ে ডোনা নাদিরার ঘনিষ্ঠ বান্ধবী ছিল, সে-ও চল্লিশ হাজার পাউন্ড চাঁদা দিয়েছে সত্যবাবাকে, স্বর্গে ঠাঁই পাবার আশায়।'

'আপনার সাথে অনেক দিনের সম্পর্ক...,' ইতস্তত করল রানা।... 'কিন্তু মি. লংফেলো, সমস্যাটা আমাদের বলি কি করে? চাঁদা আদায় যদি অবৈধ হয়ে থাকে, পুলিসই তো সেটা নিয়ে মাথা ঘামালে পারে।'

'সাধারণ পরিস্থিতিতে সেটাই স্বাভাবিক,' একমত হলেন মারভিন লংফেলো। 'কিন্তু অ্যান্টি কোরাপশন থেকে বলা হয়েছে, সত্যবাবার ওপর তারাও নজর রাখছে। আনুষ্ঠানিক ভাবে আমাদের সাহায্য চেয়েছে ওরা। সরকারের ওপর মহল থেকে আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে, সত্য সমিতির আন্দোলন ধর্মীয় সম্প্রীতি ক্ষুণ্ন করতে পারে। মুশকিল হলো, সত্য সমিতির জনপ্রিয়তা খুব বেশি। তাছাড়া, কিছু পত্র-পত্রিকাও ওদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। সমিতির বিরুদ্ধে কিছু করতে গেলে হৈ-চৈ বাধিয়ে দিতে পারে।'

'তারমানে আমরা যদি কিছু করতে চাই, গোপনে করতে হবে?'

সায় দিয়ে মাথা ঝাঁকালেন বি.এস.এস. চীফ। 'সত্যবাবার

প্রভাব খাটো করে দেখার উপায় নেই। বহু তরুণ-তরুণীকে হেরোইন আর মদের নেশা থেকে মুক্তি দিয়েছে সে। মোখলেসুর রহমান নিজেই আমাকে জানিয়েছেন, তার মেয়ে যে সত্যবাবার চিকিৎসায় সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠেছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। তাঁর ভাষায়, নাদিরাকে মৃত্যুর কোল থেকে ছিনিয়ে আনেন সত্যবাবা। কাজেই, তার বিরুদ্ধে তদন্ত চালাবার একটাই বিষয় পাচ্ছি আমরা, আদায় করা চাঁদার টাকাগুলো যাচ্ছে কোথায়? একটা দৈনিকে লেখা হয়েছে, সত্যবাবার সম্পদ নাকি কয়েকশো মিলিয়ন মার্কিন ডলার। আদায় করা সমস্ত টাকাই নাকি সরাসরি সত্যবাবার হাতে পড়ে। তার লাইফস্টাইল নাকি সামন্তযুগের রাজা-বাদশার মত।'

পুলিস সুপার উইলবার জেফারসনের দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকালেন মারভিন লংফেলো। 'পুলিস সুপার আমার কাছে এসেছেন, কারণ তোমার নাম আর ফোন নম্বর পাওয়া গেছে মেয়েটার সাথে। তিনি আমাকে আরও জানিয়েছেন, ব্যাপারটার সাথে লর্ড চেস্টারফিল্ডের মেয়ে ডোনা চেস্টারফিল্ডও জড়িত। তোমাকে ফেরত আসার জন্যে খবর দিই আমি, ইতিমধ্যে আরও কিছু অস্বাভাবিক ব্যাপার ঘটেছে।'

'অস্বাভাবিক, মি. লংফেলো?' যদিও শরীরটা দীর্ঘ সময়ের জন্যে অচেতন থাকার প্রস্তুতি নিচ্ছে, রানার মন আর মাথা পুরোপুরি সজাগ।

ব্যাখ্যা করলেন মারভিন লংফেলো। লন্ডনের পথে রয়েছে রানা, এই সময় দুটো ঘটনা ঘটেছে। প্রথমটা ছিল লর্ড চেস্টারফিল্ডের তরফ থেকে একান্ত সাক্ষাৎকারের অনুরোধ।

ভদ্রতা দেখিয়ে কয়েক মিনিটের জন্যে সরে গিয়েছিলেন সুপার ভদ্রলোক। 'পরিচয় ও খাতির থাকলেও, এখানে আমার কাছে এসে সব কথা খুলে বলতে যথেষ্ট সাহসের পরিচয় দিতে হয়েছে লর্ড চেস্টারফিল্ডকে।'

ইডিউস-এর অফিস থেকে ফোনে নাদিরা রহমানের শেষ পরিণতি সম্পর্কে জানতে পারেন লর্ড চেস্টারফিল্ড, খবরটা শোনার পর অত্যন্ত কাহিল হয়ে পড়ে তাঁর মানসিক অবস্থা। 'প্রায় কাঁদতে কাঁদতে ভেতরে ঢুকলেন।' মারভিন লংফেলোর পাথুরে চেহারা সত্যিসত্যি কোমল দেখল। 'আগে কখনও তাঁকে এরকম অবস্থায় দেখিনি। বার বার সাহায্যের আবেদন জানালেন আমার কাছে। অত্যন্ত বিব্রতকর অবস্থায় পড়তে হলো আমাকে। একটা করে কথা বলেন আর কেঁদে বুক ভাসান। তাঁর মেয়ে ডোনা সম্পর্কে সব বললেন আমাকে। নতুন কিছু নয়, এ-সব আগেই আমি জেনেছি।

'লর্ড চেস্টারফিল্ড স্বীকার করলেন, অভিশপ্ত হেরোইনের নেশা থেকে মুক্তি পায় ডোনা, কিন্তু সে তার প্রাপ সম্পত্তির ভাগ বাপের কাছ থেকে আদায় করে নেয়। নানা-নানীর রেখে যাওয়া মোটা অঙ্কের নগদ টাকাও ছিল তার নামে, সেগুলোও ব্যাংক থেকে তুলে নেয়। টাকা ও সম্পত্তি, সবই নাকি সত্যবাবাকে দিয়ে দিয়েছে। এক মাসের বেশি হলো মেয়ের কাছ থেকে কোন খবর পাচ্ছেন না ভদ্রলোক। আমার হাত জড়িয়ে ধরে কাকুতিমিনতি করলেন, আমরা যেন তাঁর মেয়েকে ফিরিয়ে এনে দিই। এমন কি কিডন্যাপ করে হলেও। ভাবাবেগ, বোঝাই যায়। তবে, সত্যি কথা বলতে কি, আমাকে নরম করে ফেলেন তিনি। হাজার হোক,

অনেকদিনের পরিচয়...'

'মি. লংফেলো, আপনি তাঁকে কোন কথা দেননি তো?' জানতে চাইল রানা।

দু'সেকেন্ড পর জবাব দিলেন মারভিন লংফেলো, 'পরিষ্কার করে কিছু বলিনি। শুধু বলেছি, ব্যাপারটা তদন্ত করে দেখব। যদি সম্ভব হয়, আনঅফিশিয়ালি কিছু করার চেষ্টা করব।' রানার দিকে আড়চোখে তাকালেন তিনি, ভাল করেই জানেন যে বি.এস.এস-এর এখন যে অবস্থা, রানার সাথে পরামর্শ না করে কাউকে কোন প্রতিশ্রুতি দেয়া উচিত হবে না।

'আনঅফিশিয়াল মানে কি পুলিস বিভাগকে দিয়ে চেষ্টা করবেন, মি. লংফেলো?'

'না, ঠিক তা নয়...' এবার রানার দিকে তাকালেন না মারভিন লংফেলো।

'ও। তদন্তটা তাহলে বি.এস.এস-ই করবে আর অপারেশনটা হবে ডিনায়েবল।'

'আসলে, তখন আমি ভেবেছিলাম...,' ইতস্তত করে চুপ করে গেলেন বি.এস.এস. চীফ।

'কারও ব্যক্তিগত অনুরোধে কোন অপারেশনে হাত দেয়া ঠিক হবে না?'

'হ্যাঁ। কিন্তু, পরিস্থিতিটা সম্পূর্ণ বদলে গেল দ্বিতীয় ঘটনাটা ঘটার পর।'

লর্ড চেস্টারফিল্ড সবেমাত্র বিদায় নিয়েছেন, এই সময় রিসেপশনে ঢুকলেন হার্বার্ট রকসন। মার্কিন দূতাবাসের

ইনফরমেশন সেক্রেটারি সে, অর্থাৎ সি.আই.এ-র লিয়াজোঁ অফিসার। 'যেন একটা ভাঁড় উদয় হলো,' বললেন মারভিন লংফেলো, প্রতিটি শব্দ থেমে থেমে উচ্চারণ করলেন, যেন শক্ত মাংস চিবাচ্ছেন। রানা জানে, হার্বার্ট রকসনকে মোটেও পছন্দ করেন না বি.এস.এস. চীফ।

'আপনি তার সাথে দেখা করলেন?'

'তখুনি। রকসন বলল, তার ইনফরমেশনটা ক্লাসিফায়েড তো বটেই, কসমিক শ্রেণীতে পড়ে। কসমিক হলো, বিদেশে প্রকাশ করা যাবে না। প্রকাশ করার অনুমতি নিতে এক হপ্তা গাধার খাটনি খাটতে হয়েছে তাকে।' অকস্মাৎ মারভিন লংফেলোর চেহারা বদলে গেল, রানা আর পুলিস সুপার জেফারসন সবিস্ময়ে লক্ষ করল প্রৌঢ় বি.এস.এস. চীফের মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। 'সি. আই. এ-ও সত্যবাবা সম্পর্কে আগ্রহী। এতটাই আগ্রহী যে তার বিরুদ্ধে বি. এস. এস-এর সাথে যৌথ তদন্ত চালাবার প্রস্তাব দিয়েছে। রকসন বিদায় নেয়ার পরপরই অ্যান্টিকোরাপশন থেকে ডিরেক্টর ভদ্রলোক ফোন করলেন। ওরা একটা ফাইল পাঠাচ্ছে সকালে। আরও জানতে পেরেছি, শুধু সি.আই.এ. নয়, মার্কিন ইন্টারনাল রেভিনিউ সার্ভিসও সত্যবাবার সাথে কথা বলতে চায়, তাদের সন্দেহ ভেড়ার ছদ্মবেশে লোকটা নাকি আসলে একটা হিংস্র নেকড়ে।' আবার এক মুহূর্ত বিরতি নিলেন তিনি, নাটকীয় ভাব আনার জন্যে। 'পীর বাবা হযরত হিকমত বাগদাদী রহমতউল্লাহ হুজুর নামে একটা নেকড়ে, তোমার বিশ্বাস হয়?'

দু'সারি দাঁতের ফাঁক দিয়ে সশব্দে বাতাস ছাড়ল রানা। 'পীর

হিকমত বাগদাদী, যার কথা এতদিন শুধু...'

'হ্যাঁ, সে-ই, যার কথা এতদিন শুধু শুনেই আসছি আমরা,' বললেন মারভিন লংফেলো। 'শুধু লম্বা একটা নয়, তার আরও অনেক ছোট ছোট নামও আছে—স্করপিয়াস, আর্মারার, জাদুকর, বন্দুকের নল, কামানের গোলা—এক একটা টেররিস্ট গ্রুপের কাছে এক এক নামে পরিচিত সে। তার সব নাম নাকি এখনও আবিষ্কার করা যায়নি।'

পীর বাবা হিকমতের ফাইলটা মনের চোখে দেখতে পেল রানা, ঢাকা টেলিফোন ডিরেক্টরির চেয়ে আকারে বড়ই হবে, অথচ সংশ্লিষ্টরা সবাই জানে ফাইলটা এখনও অসম্পূর্ণ।

'আমার সাজেশন হলো,' বললেন মারভিন লংফেলো, 'তার সম্পর্কে আমাদের ফাইলটা আরেকবার দেখো তুমি, রানা। এস.বি, স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড, অ্যান্টিকোরাপশন আর সি. আই. এ-এর ফাইলও পাব বলে আশা করছি। কাজে নামতে হলে যা জানার আছে সব তোমাকেই জেনে নিতে হবে। তারপর...আমি ভাবছি, রানা, কেসটা হয়তো তোমাকেই সামলাতে হবে...'

'মাফ করবেন, স্যার।' খুক করে কাশলেন পুলিস সুপার জেফারসন। 'আমরা জানি পীর হিকমত একজন আন্তর্জাতিক আর্মস ডিলার। তার মত নোংরা আর বিপজ্জনক লোক এই জঘন্য পেশায় দ্বিতীয়টি আছে কিনা সন্দেহ। দেখেশুনে মনে হচ্ছে, পীর হিকমত আর এম. ভি. এফ. সত্যবাবার মধ্যে কোন যোগাযোগ থাকলেও থাকতে পারে। তাই তদন্ত শুরুর আগে আরও একটা বিষয়ে আপনাকে জানাতে চাই আমি, স্যার।'

‘হ্যাঁ, বলুন,’ তীক্ষ্ণকণ্ঠে তাগাদা দিলেন মারভিন লংফেলো, জরুরী কাজগুলো তাড়াতাড়ি সারতে চান তিনি।

‘এই বিষয়টা নিয়েই লর্ড চেস্টারফিল্ডের সাথে কথা বলতে চেয়েছিলাম আমি, যদি সম্ভব হয় আর কি।’

‘হ্যাঁ?’

একপাশে কাত হয়ে কার্পেট থেকে ব্রীফকেসটা কোলের ওপর তুলে নিলেন পুলিস সুপার। ‘নাদিরা রহমানের সাথে কিছু টাকা পাওয়া গেছে। কিন্তু প্রশ্ন হলো, সে যদি তার সমস্ত সম্পত্তি আর টাকা-পয়সা সত্যবাবার হাতে তুলে দিয়ে থাকে, তাহলে তার সাথে ক্রেডিট কার্ড থাকে কি করে?’ ব্রীফকেসের ভেতর হাত ঢোকালেন তিনি। ‘তার মা-বাবা বলছেন, মেয়ের কোন ক্রেডিট কার্ড রিসিভও করেননি তারা, সে-বাবদে পেমেন্টও করেননি কখনও। অথচ মেয়েটার হাতব্যাগে এগুলো পেয়েছি আমরা।’ ব্রীফকেস থেকে ছোট একটা লেদার ম্যানিব্যাগ বের করলেন তিনি, সেটা থেকে বেরুল আমেরিকান এক্সপ্রেস-এর গোল্ড কার্ড, মার্কিন সিটি ব্যাংকের ক্রেডিট কার্ড, আমেরিকান ভিসা। ডেস্কের ওপর পাশাপাশি সাজালেন ওগুলো, সরাসরি মারভিন লংফেলোর সামনে। ‘আরও একটা আছে,’ বললেন পুলিস সুপার, তাঁর ভাব দেখে মনে হলো দক্ষ কোন জাদুকর সবাইকে তাজ্জব করে দেয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে। ‘এটা!’ ডেস্কের কার্ডগুলোর পাশে প্লাস্টিকের ছোট্ট একটা টুকরো রাখলেন তিনি, যেন রাজাকে ঘায়েল করার জন্যে টেক্কা ফেললেন টেবিলে।

এটাও অন্যান্য কার্ডগুলোর মত দেখতে, সাদা আর সোনালি রঙের, বাম দিকের নিচে নাদিরা রহমানের নাম লেখা, তার পাশে

মেয়াদ শুরু আর শেষ হওয়ার তারিখ। মাঝখানে কার্ডের নম্বর, এমবস করা। ডান দিকে ছোট একটা চতুষ্কোণ আঁকা, ভেতরে একটা লোগো–গ্রীক বর্ণমালার প্রথম ও শেষ হরফ দুটো পরস্পরের সাথে জড়িয়ে আছে। 'আলফা ও ওমেগা।' উইলবার জেফারসন লোগোটার ওপর আঙুল রাখলেন। 'দ্য বিগিনিং অ্যান্ড দ্য এন্ড।' আঙুলটা কার্ডের ওপরের অংশে সরে গেল। সোনালি এমবস করা হরফে দুটো শব্দ ছাপা হয়েছে–অ্যাভং কার্ট। 'এ-ধরনের ক্রেডিট কার্ড আগে কখনও দেখিনি আমি,' পুলিস সুপার বললেন। 'কমপিউটরেও চেক করা হয়েছে, উত্তর মেলেনি। তাই ভাবছি, লর্ড চেস্টারফিল্ড হয়তো এ-ব্যাপারে আমাদেরকে সাহায্য করতে পারবেন।'

কার্ডটার ওপর চোখ রেখে ইন্টারকম ফোনের রিসিভার তুললেন মারভিন লংফেলো, প্রাইভেট সেক্রেটারি এলিজাবেথকে বললেন, 'লর্ড চেস্টারফিল্ডকে কোথায় পাওয়া যায় দেখো। তাঁর জন্যে অফিসে অপেক্ষা করছি আমি।' কয়েক সেকেন্ড অপরপ্রান্তের কথা শুনলেন তিনি, তারপর কড়া সুরে বললেন, 'প্রধানমন্ত্রীর সাথে ডিনারে থাকলেও আমার কিছু এসে যায় না। ব্যাপারটা ইমার্জেন্সী। তাড়াতাড়ি এখানে হাজির করো তাঁকে।' মুখ তুলে ওদের দু'জনের দিকে তাকালেন তিনি। 'দেখা যাক এ-ব্যাপারে কি বলার আছে লর্ড চেস্টারফিল্ডের।' তাঁর চেহারা থম থম করছে, চোখ দুটো ঠাণ্ডা।

লর্ড চেস্টারফিল্ডের জন্যে অপেক্ষা করছে ওরা, পুলিস সুপারের সামনে কথা বলা নিরাপদ ধরে নিয়ে হেরিফোর্ড থেকে লন্ডনে আসার পথে যা যা ঘটেছে সব মারভিন লংফেলোকে জানাল রানা,

কিছুই বাদ দিল না।

খুব বেশি দেরি করলেন না লর্ড চেস্টারফিল্ড, দশ মিনিটের মধ্যে পৌঁছে গেলেন মারভিন লংফেলোর চেম্বারে, ভেতরে ঢুকে দেখলেন উপস্থিত তিনজনের চেহারাই উদ্বেগে ভারী হয়ে আছে।

পাঁচ

সত্যি কথা বলতে কি, তাঁর চেহারায় সুচারু কোন ভাব নেই। এমন বিরাট বেঢপ শরীর, আগে কখনও দেখেনি রানা। প্রকাণ্ড মুখে নাকটা বিচ্ছিরি রকম চ্যাপ্টা, চোখ দুটো ঘষা কাঁচের মত, কোটর ছেড়ে বেরিয়ে আসছে বলে মনে হয়, হাত দুটোর পেশী এখানে-সেখানে অস্বাভাবিক ফুলে আছে, মাথায় ওগুলো চুল নয় যেন শজারুর কাঁটা। পঞ্চাশের ওপর বয়স, তাঁকে দেখে ক্লান্ত, বিরক্ত, দিশেহারা ও অগোছাল লাগল রানার।

প্রাথমিক পরিচয় পর্ব শেষ হবার পর মারভিন লংফেলো তাঁকে ওয়ালটন বলে সম্বোধন করলেন, লর্ড চেস্টারফিল্ড তাঁকে মারভিন বলে।

'এটা দেখাবার জন্যে ডেকেছি তোমাকে, ওয়ালটন।' প্লাস্টিকের টুকরো অর্থাৎ অ্যাভং কার্টটা ডেস্কের ওপর দিয়ে ঠেলে দিলেন তিনি।

ক্রেডিট কার্ডটা ইতস্তত ভঙ্গিতে হাতে নিলেন লর্ড চেস্টারফিল্ড, এমন ভয়ে ভয়ে নাড়াচাড়া করলেন, ওটা যেন

একটা বোমা, যে-কোন মুহূর্তে বিস্ফোরিত হতে পারে। এক সময় বললেন, 'কী সর্বনাশ!' কার্ডটা উল্টো করে পরীক্ষা করলেন আবার। 'লোকটা তাহলে শেষ পর্যন্ত তার অন্যায় জেদ বজায় রেখেছে।'

'কোন লোক কি জেদ বজায় রাখল?' প্রশ্ন করলেন পুলিস সুপার।

একটা হাত তুলে তাঁকে চুপ থাকার ইঙ্গিত করলেন মারভিন লংফেলো, লর্ড চেস্টারফিল্ডের দিকে ফিরে তাঁর হাত থেকে কার্ডটা ফিরিয়ে নিলেন। 'আগের বৈঠকে তুমি আমাকে যা বলেছ, আমি চাই কথাগুলো এই ভদ্রলোকদেরও শোনাও তুমি, ওয়ালটন,' শান্ত সুরে বললেন তিনি।

'সত্যবাবা সম্পর্কে?'

'হ্যাঁ, বিশেষ করে তার প্রস্তাবটা সম্পর্কে বলো, তোমার ব্যাংকে।'

প্রকাণ্ড মাথাটা ঝাঁকালেন লর্ড চেস্টারফিল্ড, ডেস্কে পড়ে থাকা কার্ডটার দিকে আরেকবার তাকালেন। নিঃশব্দে মাথা নাড়লেন তিনি, যেন এখনও ব্যাপারটা বিশ্বাস করতে পারছেন না। 'ওঁরা কি জানেন?'

'তোমার মেয়ের কথা? ডোনা আর সত্য সমিতি সম্পর্কে? হ্যাঁ, সবই জানেন ওঁরা। তোমার চিন্তার কিছু নেই, ওয়ালটন। সত্যবাবার সাথে তোমার যে কথাবার্তা হয়েছে সেটা শুধু বলো ওঁদেরকে।'

'ঠি-ঠিক আছে।' বেঢপ হাত দুটো হাঁটুর ওপর রাখলেন লর্ড চেস্টারফিল্ড, ভঙ্গিটা দৃষ্টিকটু মনে হওয়ায় বুকের ওপর ভাঁজ

করলেন সেগুলো। ‘আপনারা জানেন, আমার মেয়ের একটা সমস্যা ছিল?’ শুরু করলেন তিনি, বিরতি নিতে দেখে বোঝা গেল এ-প্রসঙ্গে কথা বলতে ভাল লাগছে না। তারপর থেমে থেমে, একঘেয়ে সুরে বলে গেলেন।

তাঁর হিসাব মতে, সাত মাস হলো হেরোইনের অভিশাপ থেকে মুক্তি পেয়েছে ডোনা। হোস্টেল থেকে একদিন ফোন করে জানায়, সত্য সমিতিতে নাম লিখিয়েছে সে, বাড়িতে আর ফিরবে না। ‘আমরা ভেবেছিলাম, খেয়ালী মেয়ে, এটাও তার নতুন কোন খেয়াল হবে।’

‘কিন্তু ব্যাপারটা সিরিয়াস ছিল,’ নরম সুরে বলল রানা, লর্ড চেস্টারফিল্ডের জন্যে পরিবেশটা সহজ করতে চাইছে ও।

‘সিরিয়াস ঠিক কোন্ অর্থে, আমরা বুঝতে পারিনি। মেয়ের ইচ্ছা-অনিচ্ছায় আমরা কখনও বাদ সাধিনি। কোন ব্যাপারেই কখনও জেদ ধরতে হয়নি তাকে। সেই যখন পুতুল নিয়ে খেলত...’

মনে মনে হতাশ হলো রানা। অপ্রাসঙ্গিক কথা বলে সময় নষ্ট করছেন ভদ্রলোক।

‘সময়টা এমন ছিল, মেয়ের যে-কোন আবদার রক্ষা করার জন্যে একপায়ে খাড়া হয়ে আছি আমরা। সে তার ধর্মগুরুর কথা বলল আমাদের। নিজেকে তিনি কখনও ফাদার বলেন, কখনও ভগবান, আবার কখনও মাওলানা। তবু, স্বভাবতই, তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞবোধ করি আমরা–তাঁর অবদান শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি। আমার কথা বুঝতে পারছেন তো?’

‘জ্বী,’ বলল রানা।

'কাজেই ডোনা যখন বলল তার ধর্মগুরু কিছু পরামর্শ চান—ব্যাংক সংক্রান্ত পরামর্শ—তাঁর সাথে দেখা করতে রাজি হলাম আমি।' এই প্রথম নিঃশব্দে, মৃদু হাসলেন লর্ড চেস্টারফিল্ড।

হাসিটা ম্লান, বিষণ্ন আর তিক্ত লাগল রানার।

'ভেবেছিলাম ভদ্রলোক আমার কাছে, মানে আমার ব্যাংক থেকে, টাকা ধার চাইবেন।' চেহারায় আক্রমণাত্মক একটা ভাব নিয়ে উপস্থিত সবার দিকে একবার করে তাকালেন লর্ড চেস্টারফিল্ড। 'সত্যি কথা বলতে কি, চাইলে তখন তাঁকে আমি ধার দিতামও। অবশ্যই যুক্তিসঙ্গত ইন্টারেস্টের বিনিময়ে। অনুভব করি, অন্তত এ-টুকু আমার করা উচিত তাঁর জন্যে।'

দম নিলেন ভদ্রলোক।

তারপর আবার শুরু করলেন। একদিন তাঁর ব্যাংকের হেড অফিসে এলেন সত্যবাবা। না, টাকা ধার করতে নয়। একটা ক্রেডিট কার্ড কোম্পানী চালু করার জন্যে ফাইন্যানশিয়াল বুদ্ধি-পরামর্শ চাইলেন তিনি। লর্ড চেস্টারফিল্ড তাঁকে বোঝাবার চেষ্টা করলেন, এ-ধরনের কোম্পানী চালাবার অনুমতি পাওয়া বা অনুমতি পাবার পর কাজ চালানো অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। হাতে গোণা যে দু'একটা কোম্পানী ক্রেডিট কার্ড বাজারে চালু করছে সেগুলোর গুডউইল আর আর্থিক সচ্ছলতা প্রশ্নাতীত তো বটেই, দেশী-বিদেশী বিভিন্ন ব্যাংক, ফাইন্যানশিয়াল ইনস্টিটিউশন, ও এমন কি বিশ্ব-ব্যাংকেরও অনুমোদন তথা সহায়তা আছে। তাছাড়া, ক্রেডিট কার্ড গ্রহণ করবে যারা—দোকান-পাট, ব্যাংক, পোস্ট অফিস, হোটেল-রেস্তোরাঁ, ক্লাব ইত্যাদি সরকারী-বেসরকারী সংস্থা ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সাথেও কোম্পানীগুলোকে

একটা চুক্তিতে আসতে হয়েছে।

'তাঁর কথা শুনে মনে হলো, তিনি তাঁর অনুসারীদের নির্দিষ্ট কিছু আর্থিক সুবিধে দিতে চান। বিবাহ বন্ধনের পবিত্রতা রক্ষায় তারা আপোষহীন, এ-কথা জানিয়ে আমাকে তিনি বললেন, সমিতির সদস্যদের মধ্যে দরিদ্র ও ধনী, দু'ধরনের মানুষই আছে—কিন্তু তিনি চান, ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সবাই বিবাহিত জীবন শুরু করবে সমান আর্থিক সঙ্গতি নিয়ে। তিনি আমাকে তাঁর কিছু ব্যাংকিং অ্যারেঞ্জমেন্ট দেখালেন। যুক্তরাষ্ট্র, ভারত, ফিলিপাইন, লেবানন, ব্রিটেন, সুইডেন, হংকং, সুইটজারল্যান্ডে তাঁর অ্যাকাউন্ট আছে। কাগজ-পত্রগুলো যদি জাল না হয়, তাঁর আর্থিক প্রাচুর্য সম্পর্কে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। তবু, তাঁকে আমি স্পষ্ট করে সরাসরি জানিয়ে দিই, এ-ধরনের ক্রেডিট কার্ড চালু করলে সরকারের সাথে তাঁর বিরোধ বাধবে, আইনের কথা নাহয় না-ই বললাম।'

'বোঝা যাচ্ছে আপনার পরামর্শ গুরুত্ব দেয়নি সত্যবাবা,' বলল রানা।

'দেননি,' বললেন লর্ড চেস্টারফিল্ড। 'কিন্তু ব্যাপারটা আমার জন্যে বিস্ময়কর। কোন্ অর্থে জানেন? নিজেকে নিয়ে আমার গর্ব আছে, দেশী ও আন্তর্জাতিক ফাইন্যান্স জগতের সমস্ত খবর আমার কাছে আসে—কিন্তু অ্যাভং কার্ট যে চালু হয়েছে, কই, কেউ তা আমাকে বলেনি। চিন্তার কথা! ভারি চিন্তার কথা!'

'তিনি কি বলেছিলেন, কি নাম হবে তাঁর কার্ডের?' জানতে চাইলেন পুলিস সুপার।

'হ্যাঁ, বলেছিলেন।' পুলিস সুপারের দিকে এমন কড়া চোখে

তাকালেন লর্ড চেস্টারফিল্ড, তিনি যেন বোকার মত একটা প্রশ্ন করেছেন। 'সেজন্যেই তো অবাক হচ্ছি আমি। মারভিনের ডেস্কে কার্ডটা দেখে প্রথমে আমি নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। আমার মনে আছে, পরিষ্কার উচ্চারণে বলেছিলেন তিনি, তাঁর কার্ডের নাম হবে অ্যাভং কার্ট।' কথা শেষ করে চেয়ারে নেতিয়ে পড়লেন ভদ্রলোক।

'লোকটা আর কি বলল জানাও ওদের।' রিভলভিং চেয়ারে নড়েচড়ে বসলেন মারভিন লংফেলো।

'মেজাজ দেখাবার বা বিদ্বেষ প্রকাশ করার মত মানুষ নন তিনি। তবে যাবার সময় বলে গেলেন, বেশ গর্বের সাথেই, এমন একদিন আসবে যেদিন সমস্ত ক্রেডিট কার্ডের চেয়ে তাঁর ক্রেডিট কার্ডটা হবে অনেক বেশি শক্তিশালী। ঠিক এই শব্দগুলো ব্যবহার করেছিলেন তিনি—অনেক বেশি শক্তিশালী।

'সত্যবাবাকে আপনার কেমন লাগল? তাঁকে আপনি পছন্দ করতে পারলেন?' জানতে চাইলেন পুলিস সুপার।

'ভাল লেগেছে, এ-কথা বলতে পারি না। তাঁর মধ্যে কি যেন একটা গরমিল আছে। আজব ব্যাপার, ধরতে পারিনি কি সেটা। শুধু মনে হয়েছে, অশুভ। শান্ত, বুদ্ধিমান, ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, জ্ঞানী, অথচ অশুভ। ঠিক মেলে না ব্যাপারটা।'

'দেখে শান্ত, বুদ্ধিমান, ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন ও জ্ঞানী বলে মনে হয়,' বললেন পুলিস সুপার, 'এমন অনেক খুনী দেখেছি আমি। তারা অবশ্য কোল্ড-ব্লাডেড কিলারস।'

'আপনি তাকে ক্ষান্ত করার চেষ্টা করলেও, তাঁর ভাব দেখে মনে হলো, নিজের ক্রেডিট কার্ড তিনি চালু করার ব্যাপারে দৃঢ়

প্রতিজ্ঞ?' জানতে চাইল রানা।

'হ্যাঁ। রীতিমত জেদ ধরলেন তিনি। ক্রেডিট কার্ডটা যেন তাঁর ঘাড়ে ভূতের মত সওয়ার হয়ে বসেছিল। হয়তো সেজন্যেই তাঁকে আমার অশুভ বলে মনে হয়েছে। তবে একবারও ভাবিনি, কার্ডটা তিনি সত্যিই চালু করবেন।'

'এই জেদটা ছাড়া তাঁর মধ্যে অস্বাভাবিক আর কিছু দেখেননি আপনি?' এটাও রানার প্রশ্ন।

ভুরু কোঁচকালেন লর্ড চেস্টারফিল্ড, প্রকাণ্ড মুখে অনেকগুলো ভাঁজ পড়ল। তাঁর ভাবসাব লক্ষ করে বাচ্চা একটা ছেলের কথা মনে পড়ে গেল রানার, ধাঁধার জবাব দেয়ার আগে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করছে। অবশেষে তিনি বললেন, না। তাঁর ভাষায়, ভদ্রলোক অত্যন্ত মিষ্টভাষী, কথা বলেন ধীরে ধীরে, বিনয়ের সাথে—শুধু অ্যাভং কার্ট প্রসঙ্গে তাঁকে অন্য রকম দেখেছেন তিনি। 'তবে তাঁর চোখ আছে বটে,' বললেন লর্ড চেস্টারফিল্ড, যেন মানুষের চোখ থাকাটা অস্বাভাবিক একটা ঘটনা। 'মানে, বলতে চাইছি, তাঁর চোখে কিছু একটা আছে। কি বলা যায়? জাদু? অসম্ভব পরিষ্কার, স্বচ্ছ, অন্তর্ভেদী। দৃষ্টিটা যেন আপনাকে ভেদ করে যায়। বুঝতে পারছেন কি বলতে চাইছি?'

'রঙ?' জানতে চাইলেন মারভিন লংফেলো।

'কি?'

'লোকটার চোখের রঙ কি? মনে আছে তোমার?'

এবার উত্তর পেতে দেরি হলো না। 'কালো। রাতের মত কালো।' হঠাৎ থামলেন লর্ড চেস্টারফিল্ড, চেহারায় হতভম্ব একটা ভাব। 'আচ্ছা, এ-কথা কেন বললাম? রাতের মত কালো! কোন

জিনিস সত্যি কালো হলে আমি সাধারণত বলি, জেট ব্ল্যাক।'

রাতের মত কালো চোখ, চেহারায় ও আচরণে অশুভ ভাব, অথচ বিনয়ী, অন্তর্ভেদী দৃষ্টি, মিষ্টভাষী—ভাবছে রানা। শুধু অশুভ নয়, সত্যবাবাকে আরও ভয়ানক কিছু মনে হলো ওর। 'আপনি তাঁকে ওই একবারই দেখেছেন?' জিজ্ঞেস করল ও।

মাথা ঝাঁকালেন লর্ড চেস্টারফিল্ড। 'একবারই। এরপর সমিতির আখড়ায় ফিরে গেল ডোনা। দু'বার টেলিফোন করে সে। কয়েকশো চিঠি লিখেছি। উত্তর দেয়নি। ওর মামী ভীষণ ভেঙে পড়ে। আমিও হাল ছেড়ে দিই। এই সত্যদর্শীরা অদ্ভুত জীব! ভাবতেও পারিনি, সমস্ত টাকা-পয়সা ওদেরকে দিয়ে দেবে ডোনা। কিন্তু তাই করেছে ও। সব দান করে নিঃস্ব হয়ে গেছে মেয়েটা, নিজের বলে কিছু রাখেনি।'

'ঠিক আছে।' গলা পরিষ্কার করলেন মারভিন লংফেলো। 'ঠিক আছে, সময় দেয়ার জন্যে ধন্যবাদ, ওয়ালটন। আমি চেয়েছিলাম, এই ভদ্রলোকরা তোমার মুখ থেকে গল্পটা শুনুন। তোমাকে জানিয়ে রাখছি, এই ক্রেডিট কার্ড নিয়ে তদন্ত হবে। ফ্রড স্কোয়াডও আলাদাভাবে কাজ শুরু করবে। তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারো, সত্যবাবা আর তার অনুসারীদের ওপর খুব কাছ থেকে নজর রাখব আমরা।'

'বার্কশায়ার, প্যাঙবোর্ন-এ ওদের আস্তানাটার কথা জানো তুমি? আমাদের ডাকাবুকো হামফ্রে...'

'স্যার মরগান হামফ্রে,' রানার দিকে চেয়ে বললেন মারভিন লংফেলো।

'হ্যাঁ। প্রাচীন একটা জমিদার বাড়ি—ডাকাবুকো ওটাকে

নিজের বাগানবাড়ি বানিয়েছিল। বিক্রি না করে উপায় ছিল না। আজকাল অত বড় বাড়ি দেখাশোনা করবে কে? সব মিলিয়ে প্রায় একশোর মত কামরা। কয়েক একর জায়গা নিয়ে বাড়িটা। পুকুরগুলো একেকটা লেক, ভাল মাছ পাওয়া যায়। সবাই মিলে, মনে নেই তোমার, কত পিকনিক করেছি ওখানে আমরা? ডাকাবুকো উঠে এসেছে মেফেয়ারের ছোট্ট ফ্লাটে। মাঝে মধ্যে ক্লাবে দেখা হয়...'

'ধন্যবাদ, ওয়ালটন,' বাধা দিয়ে লর্ড চেস্টারফিল্ডকে থামিয়ে দিলেন মারভিন লংফেলো। 'আমি তোমার সাথে যোগাযোগ রাখব।'

'হ্যাঁ, আমাকে এবার উঠতে হয়...'

এই সময় বি.এস.এস. চীফের ইন্টারকম বেজে উঠল। সাধারণত সন্ধ্যা ছ'টায় ছুটি নেয় এলিজাবেথ, আজ তাকে থাকতে হয়েছে। মাঝরাত পেরিয়ে গেছে বেশ কিছুক্ষণ আগে।

রিসিভারে এলিজাবেথের কথা শুনে মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন মারভিন লংফেলো, 'কখন?' তারপর, 'ইয়েস। আই সী।' তাঁর দৃষ্টি মুহূর্তের জন্যে রানার ওপর স্থির হলো, তাতে অনিশ্চয়তা বা উদ্বেগ রয়েছে বলে সন্দেহ করল রানা। 'হ্যাঁ,' আবার বললেন বি.এস.এস. চীফ। 'হ্যাঁ, ব্যাপারটা আমাদের ওপর ছেড়ে দাও। আমিই তাঁকে জানাব। বাকি যা করার রানা আর পুলিস সুপার করবেন। গুড।' রিসিভার নামিয়ে রেখে লর্ড চেষ্টারফিল্ডের দিকে তাকালেন তিনি। 'তোমার জন্যে একটা বিস্ময় অপেক্ষা করছে, ওয়ালটন।'

'বিস্ময়? আমার জন্যে?' ব্যাকুল হলেন লর্ড চেস্টারফিল্ড, ধাক্কা সামলাবার জন্যে শক্ত করলেন নিজেকে। 'দুঃসংবাদ?'

'না। সম্ভবত সুসংবাদ। তোমার মেয়ে ফিরে এসেছে।'

'ডোনা? কোথায়? আমার ডোনা ভাল আছে তো?' চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন লর্ড চেস্টারফিল্ড। একটু একটু কাঁপছেন তিনি।

'বসো, ওয়ালটন। শান্ত হও। বাড়িতে পৌঁচেছে সে। তোমার বাড়িতে। একটু বোধহয় নার্ভাস। একজন ডাক্তার দেখানো দরকার। তবে সত্যবাবার খপ্পর থেকে ফিরে আসতে পেরেছে এটাই বড় কথা।'

ধীরে ধীরে বসে পড়লেন লর্ড চেস্টারফিল্ড, তাঁর ঠোঁট নড়ছে, চোখে ঝাপসা দৃষ্টি। ভদ্রলোক অসুস্থ হয়ে পড়বেন বলে সন্দেহ হলো রানার। 'আমার তাহলে এখুনি ফেরা দরকার।' চেয়ারটা শক্ত করে আঁকড়ে ধরে আছেন, যেন তাঁর সাহায্য দরকার। 'কি ঘটছে বুঝতে পারছি না। তুমি বলছ ডাক্তার দরকার। আপনারা যদি আমাকে ক্ষমা করেন...'

'না,' এমন কর্তৃত্বের সুরে বললেন মারভিন লংফেলো, এমনকি একজন প্রধানমন্ত্রীর পক্ষেও নির্দেশটা অমান্য করা সম্ভব নয়। 'না। এই ভদ্রলোকের সাথে যাবে তুমি।' মুখ তুলে দরজার দিকে তাকালেন, নিঃশব্দে চেম্বারে ঢুকছে এলিজাবেথ। 'আমার সেক্রেটারি, এলিজাবেথ, তুমি চেনো। প্রথমে ওর সাথে যাও—ও তোমাকে চা বা কফি খাওয়াবে। না-কি অন্য কিছু চাও? ইতিমধ্যে পুলিস সুপার আর রানার সাথে কথা বলব আমি। তারপর ওরা তোমাকে নিয়ে যাবে। আমার বিশ্বাস, সেটাই তোমার জন্যে ভাল

হবে, ওয়ালটন।'

'বেশ, তুমি যখন বলছ...কিন্তু তার আগে বাড়িতে একটা ফোন করা উচিত নয় আমার? আমার স্ত্রীর সাথে কথা বলা দরকার নয়?'

'যা বলছি শোনো, ওয়ালটন। লিজার সাথে যাও। আমি তোমাকে বলেছি, সব ঠিক হয়ে যাবে।'

নেশাগ্রস্ত ও আচ্ছন্ন দেখাল লর্ড চেস্টারফিল্ডকে, প্রায় টলতে টলতে লিজার পিছু পিছু চেম্বার থেকে বেরিয়ে গেলেন তিনি।

দরজা বন্ধ হবার সাথে সাথে কথা বলতে শুরু করলেন মারভিন লংফেলো। প্রায় বিশ মিনিট হলো ইটন স্কয়ারে, লর্ড চেস্টারফিল্ডের বাড়ির সামনে ডোনাকে দেখতে পায় টহল পুলিস। তার অবস্থা ছিল, টহল পুলিসের ভাষায়, 'প্রায় অচেতন'। তাদের ধারণা, মেয়েটা মদ বা হেরোইন খেয়েছে। ওকে থানায় নিয়ে যাওয়ার আয়োজন হচ্ছিল, এই সময় লেডি চেস্টারফিল্ড বাড়ির গেটে আওয়াজ শুনে বেরিয়ে আসেন, চিনতে পারেন নিজের মেয়েকে।

'সত্যি আমি দুঃখিত, রানা,' বি. এস. এস. চীফ বললেন। 'জানি সারাটা দিন তোমার ওপর দিয়ে কী ধকল গেছে, কিন্তু আমার ধারণা মারাত্মক কিছু একটার ওপর চোখ পড়েছে আমাদের। এ-ব্যাপারে খুব তাড়াতাড়ি কিছু একটা না করা গেলে ব্যাপারটা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে পারে। আমি চাই, তোমরা দু'জনেই লর্ড চেস্টারফিল্ডের সাথে যাও, মেয়েটাকে দেখো, কথা বলো ডাক্তার ভদ্রলোকের সাথে। তোমরা না পৌঁছুনো পর্যন্ত অপেক্ষা করবেন তিনি। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব রিপোর্ট করবে, রানা।

তারপর আমরা দেখব কি ব্যবস্থা নেয়া যায়।'

'মি. লংফেলো, প্যাঙবোর্নে...'

'জানি, দেরি না করে সত্য সমিতির আস্তানাতেও একজন লোককে পাঠানো দরকার। কাকে পাঠানো যায় ভাবছি। সবাই একটা না একটা কাজে ব্যস্ত। ঠিক আছে, আগের কাজ আগে। আমি চাই, আপনারা দু'জনেই হিকমত/সত্যবাবার ফাইলটা পড়ুন। রকসনও একটা ডোশিয়ে দেবে, সেটাও তোমার পড়া দরকার, রানা।'

'মি. লংফেলো, খানিক পর হলেও, ঘণ্টা কয়েকের জন্যে ঘুমিয়ে নিতে না পারলে অচল হয়ে পড়ব আমি,' ক্লান্ত স্বরে বলল রানা। 'আমার পক্ষে প্যাঙবোর্নে যাওয়া বোধহয় সম্ভব হবে না।'

চেহারা আরও ভারী ও থমথমে হয়ে উঠল মারভিন লংফেলোর। 'না। না, তোমাকে কেউ সুপারহিউম্যান ভাবছে না। তবে অন্য একটা কাজের জন্যে তোমাকে দরকার হতে পারে। জানোই তো, এই মুহূর্তে লোকের অভাবে ভুগছি আমরা। প্রশ্ন হলো, প্যাঙবোর্নে কাকে আমরা পাঠাতে পারি?' রানার পরামর্শ চাইলেন তিনি।

'বাইরের কোন ট্যালেন্ট ব্যবহার করা যায়?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'কি ধরনের ট্যালেন্ট?'

'ট্রেনিং ক্যাম্পের একজন সার্জেন্ট, মি. লংফেলো। হেরিফোর্ড থেকে আমাকে লন্ডনে নিয়ে এল যে। ট্রেইন্ড। ভাল রিফ্লেক্স। সব রকম ট্রিকস জানা আছে। এর আগেও এ-ধরনের ক্যাম্প থেকে দু'একজন লোককে কাজে লাগিয়েছি আমরা।'

‘হ্যাঁ, তা লাগিয়েছি।’ মারভিন লংফেলোকে তেমন উৎসাহী মনে হলো না। তারপর তিনি জানতে চাইলেন, ‘তার নাম, ফোন নম্বর, এ-সব তোমার কাছে আছে?’

‘জ্বী, আছে।’

‘রেখে যাও। নামটা কি যেন বলেছিলে... লেম্যান না কি যেন?’

সার্জেন্টের নাম আর ফোন নম্বর মুখস্থ বলে গেল রানা।

মাথা ঝাঁকালেন মারভিন লংফেলো। ‘তার কমান্ডিং অফিসারের সাথে কথা বলব আমি। ঠেকায় পড়লে কি আর করা, বাইরের সাহায্য নিতেই হয়।’ চেহারায় বিষণ্ন, তিক্ত একটা ভাব নিয়ে মুখ তুললেন তিনি। ‘রাতটা এখানেই থাকব আমি। লর্ড চেস্টারফিল্ডকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ো তোমরা।’

খুক করে কেশে দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন পুলিস সুপার জেফারসন। তারপর সবিনয়ে হাসলেন। ‘উইথ রেসপেক্ট, স্যার, সময় থাকতে আমি বরং আমার ডিরেক্টরের কাছ থেকে এই অ্যাসাইনমেন্টের জন্যে অনুমতিটা নিয়ে নিই?’

হাত ঝাপটালেন মারভিন লংফেলো। ‘তা দরকার হবে না। ডিরেক্টরের সাথে আমিই কথা বলব। আপনি চিন্তা করবেন না।’

চেহারায় অনিশ্চিত ভাব থাকলেও, মাথা ঝাঁকিয়ে সম্মতি জানালেন পুলিস সুপার, রানাকে অনুসরণ করে বেরিয়ে এলেন চেম্বার থেকে।

অ্যান্টিরূমে বসে আছেন লর্ড চেস্টারফিল্ড। লিজার এখানে একচ্ছত্র আধিপত্য। প্রকাণ্ড একটা কাপে কফি দেয়া হয়েছে ভদ্রলোককে, থেমে থেমে চুমুক দিচ্ছেন তিনি, তাঁর ওপর ঝুঁকে

রয়েছে লিজা।

'আমরা রেডি, স্যার,' পুলিস সুপার উদ্যোগী ভূমিকা নিলেন।

'আমার মেয়ে ভাল আছে তো, অফিসার? আমার ডোনার কোন ক্ষতি হয়নি তো?' হঠাৎ করে যেন বয়স বেড়ে গেছে লর্ড চেস্টারফিল্ডের, বোঝাই যায় মেয়েকে ডাক্তার দেখাবার দরকার আছে শুনে মুষড়ে পড়েছেন ভদ্রলোক। খুবই স্বাভাবিক, ভাবল রানা, বিশেষ করে তাঁর বন্ধুর মেয়ে নাদিরা রহমানের কপালে কি ঘটেছে জানার পর।

পুলিস সুপার উইলবার জেফারসন সম্পূর্ণ শান্ত। 'আপনার মেয়ে,' মৃদু অথচ স্পষ্টকণ্ঠে বললেন তিনি, 'ঠিক সুস্থ নয়, স্যার। কিছু একটা নেশা করেছে সে। ওখানে পৌঁছুবার আগে কথাটা আপনার জানা দরকার।'

'আবার!' আঁতকে উঠলেন লর্ড চেস্টারফিল্ড।

'জিনিসটা হেরোইন নাকি অ্যালকোহল, ডাক্তার এখনও ঠিক ধরতে পারেননি। আসল কথা হলো, স্যার, আপনার মেয়ে বাড়ি ফিরে এসেছে। এর মানে হলো, সত্যবাবার প্রভাব থেকে মুক্তি পেয়েছে সে। চলুন, দেখা যাক, তার জন্যে কি করতে পারি আমরা।'

বি. এস. এস. হেডকোয়ার্টার থেকে বেরুবার সময় রানার কাছে বিড়বিড় করে পুলিস অফিসার বললেন, তিনি আশা করেন মেয়েটা সত্যবাবার প্রভাব কাটিয়ে উঠতে পেরেছে। তাঁর উদ্বিগ্ন চেহারা দেখে রানা ভাবল, ওর নিজের চেহারারও একই দশা হয়েছে কিনা।

অভিজাত ইটন স্কয়্যারে পৌঁছে গেল ওরা। বাড়ির সামনে

দুটো গাড়ি দাঁড়িয়ে রয়েছে, গেটের ভেতরটা আলোকিত। গেটের বাইরে ইউনিফর্ম পরা একজন পুলিসকে দেখা গেল। তাকে নিজের পরিচয়পত্র দেখালেন পুলিস সুপার, ঠকাস করে স্যালুট ঠুকল লোকটা। ভেতরে ঢোকার পর ওদেরকে পথ দেখিয়ে হলরূমে নিয়ে এল এক যুবতী, বাড়ির মেইড সার্ভেন্ট হবে। ওদেরকে রেখে চলে গেল সে, খানিক পর ফিরে এসে বলল, 'আসুন, স্যার।'

মূল্যবান ও রুচিসম্মত আসবাবে সাজানো একটা ড্রইংরূমে ঢুকল ওরা। ভেলভেটের ড্রেসিং গাউন পরা মধ্যবয়স্কা এক মহিলাকে দেখা গেল, হস্তিনীই বলা চলে, তার পাশে দাঁড়িয়ে আছেন খর্বকায় এক তরুণ, চেহারায় ডাক্তার সুলভ সমস্ত লক্ষণ ফুটে আছে, পরনে ডোরাকাটা সুতী কাপড়ের স্যুট, সিল্ক টাই। প্রকাণ্ড ভালুকের মত থপথপ আওয়াজ তুলে কামরায় ঢুকলেন লর্ড চেস্টারফিল্ড। চেয়ার ছেড়ে দাঁড়ালেন লেডি চেস্টারফিল্ড, দু'জন মুখোমুখি হলেন কামরার মাঝখানে। পরস্পরকে আলিঙ্গন করলেন তাঁরা, ছোটখাট একটা সংঘর্ষের মতই হলো ব্যাপারটা, প্রায় শিউরে উঠল রানা। দুটো প্রকাণ্ড দেহ জোড়া লেগে এক হয়ে গেল। এক সময় স্ত্রীকে আলিঙ্গনমুক্ত করলেন লর্ড চেস্টারফিল্ড, দু'চোখ ভরা পানি নিয়ে লেডি চেস্টারফিল্ড বললেন, 'ওয়ালটন, ওহ্, ওয়ালটন!'

'শান্ত হও, মাই লাভ, শান্ত হও!' সান্ত্বনা দিলেন লর্ড চেস্টারফিল্ড। 'মোনা, কেমন আছে ও?'

দৃশ্যটা হাস্যকরই বলা যায়, তবে ওদের কথাবার্তা থেকে বেশ কিছু তথ্য পাওয়া গেল। ডোনার জ্ঞান নেই। ডাক্তারের

ধারণা, ড্রাগসের শিকার মেয়েটা–হেরোইন নয়, অন্য কিছু হবে।

রানার কাঁধে টোকা দিলেন পুলিস সুপার, মধ্য মঞ্চের নাটক থেকে মনোযোগ সরিয়ে ডাক্তারের দিকে ফিরল ওরা। 'আপনি কোন বিশেষজ্ঞকে ডেকেছেন?' পরিচয় পর্ব সারার পর অল্পবয়েসী ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করল রানা। ডাক্তারের নাম ডানিয়েল, প্রশ্নটা শুনে বাক্‌শক্তি হারিয়ে ফেললেন তিনি। নিঃশব্দে শুধু মাথা ঝাঁকালেন।

'আপনার কি ধারণা?' জানতে চাইলেন পুলিস সুপার।

'আপনাদের অপেক্ষা করা উচিত। আমি একজন ডাক্তার, আমার কিছু প্রফেশন্যাল বাধ্যবাধকতা আছে।'

'এথিক্স নিয়ে বাড়াবাড়ি করার সময় এটা নয়, ডাক্তার সাহেব,' তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলল রানা। 'আপনি বুঝতে পারছেন না, আমরা আইনের লোক? বলুন, প্লীজ,–আপনার ব্যক্তিগত ধারণা কি?'

'আমি বলব, কেউ তাকে কয়েক ধরনের ড্রাগ মিলিয়ে ককটেল খাইয়ে দিয়েছে। রোগিণীর সাথে একজন নার্স রেখেছি আমি...'

'বাঁচবে তো?' বাধা দিয়ে জানতে চাইল রানা।

পালিশ করা চকচকে জুতোর ওপর চোখ রেখে ডাক্তার বললেন, 'তাকে আমি স্যালাইন দিচ্ছি, সামান্য অ্যান্টিটক্সিনও দিয়েছি...'

'কিছু বলেছে সে?'

'হ্যাঁ, ঘোরের মধ্যে। কখনও একদম নেতিয়ে পড়ে, তারপর

হঠাৎ ছটফটে একটা ভাব দেখা যায়। একটা কথাই বারবার বলতে শুনেছি–"সত্য সমিতির জয় হবে! সত্য সমিতির জয় হবে!" ।'

'তাকে আমরা দেখতে পারি?' জিজ্ঞেস করলেন পুলিস সুপার।

নিয়ম আর বাধ্যবাধকতার কথা ভেবে আবার কিছুক্ষণ ইতস্তত করলেন ডাক্তার, তারপর কি ভেবে ইঙ্গিতে পিছু নিতে বললেন। কামরা থেকে বেরুবার সময় তিনজনই ওরা লক্ষ করল, লেডি ও লর্ড চেস্টারফিল্ড পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে সান্ত্বনা দিচ্ছেন।

ডোনার কামরাটা মাঝারি আকৃতির, হালকা আসবাবে সাজানো। শুধু বেডসাইড ল্যাম্পটা জ্বলছে, বিছানাটা ছায়ার ভেতর। সুন্দরী একজন নার্স স্যালাইনের ফোঁটা নিয়ন্ত্রণের কাজে ব্যস্ত, নির্লিপ্ত চেহারা। বিছানায় শুয়ে রয়েছে মেয়েটা, চাদর দিয়ে গলা পর্যন্ত ঢাকা, চাদরের বাইরে বেরিয়ে আছে শুধু একটা হাত। পুলিস সুপার আর রানাকে পিছনে রেখে রোগিণীর ওপর ঝুঁকে পড়লেন ডাক্তার, নরম সুরে কথা বলতে শুরু করলেন।

চাদরের তলায় দৈহিক কাঠামোটা আঁচ করতে পারল রানা। মা-বাবার ঠিক উল্টো, একহারা ডোনাকে লম্বাই বলা যায়। মুখের আদল সূর্যমুখীর মত, চেহারায় কোন কষ্ট বা ব্যথার ছাপ নেই। মাথার বালিশটা প্রায় ঢাকা পড়ে গেছে কালো চুলের স্তূপে। রানা আর পুলিস সুপার তার ওপর ঝুঁকে দাঁড়িয়ে থাকল কিছুক্ষণ, কয়েক সেকেন্ড পর সিধে হলেন উইলবার জেফারসন, এই সময় বেডসাইড টেবিলের পাশে, কার্পেটের ওপর চামড়ার তৈরি

হাতব্যাগটা তাঁর চোখে পড়ল। ব্যাগটা রোগিণীর কিনা জিজ্ঞেস করলেন তিনি। ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকাল নার্স। মেঝে থেকে ওটা তোলার জন্যে এগোলেন পুলিস সুপার, তাঁকে বাধা দিতে গেল নার্স। কিন্তু বিড়বিড় করে নিষেধ করলেন ডাক্তার।

হাতব্যাগটা খুলে ভেতরটা পরীক্ষা করছেন পুলিস সুপার। বিছানার ওপর এখনও ঝুঁকে রয়েছে রানা। ডোনার মুখ থেকে চোখ সরাতে পারছে না ও। এক কি দেড় মিনিট পর ওর কাঁধে আবার টোকা দিলেন উইলবার জেফারসন। ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল রানা, দেখল পুলিস সুপারের হাতে একটা অ্যাভং কার্ট রয়েছে। ক্রেডিট কার্ডটায় নামের জায়গায় লেখা রয়েছে–ডোনা চেস্টারফিল্ড।

পরস্পরের দিকে তাকাল ওরা, ভুরু জোড়া সামান্য উঁচু করল রানা, এই সময় বিছানায় শব্দ হলো। নড়ে উঠল ডোনা, গোঙানির আওয়াজ বেরিয়ে এল গলা থেকে।

ঘাড়ের পেছনে খাড়া হয়ে গেল রানার চুল। এত সুন্দর মেয়েটার গলা থেকে এমন একটা আওয়াজ বেরিয়ে এল, যেন কবরের ভেতর থেকে কর্কশ, দুর্বোধ্য, যন্ত্রণাকাতর অতৃপ্ত একটা আবিলাপ করছে। 'সত্য সমিতির জয় হবে! সত্যদর্শীরা দুনিয়াটা দখল করে নেবে!' শোনামাত্র রানা উপলব্ধি করল, কথাগুলো ডোনা বলছে না। একই কথা বারবার বলে গেল মেয়েটা, 'আমরা যারা স্বর্গযাত্রী, দুনিয়াটাও তাদের দখলে চলে আসবে। সত্য সমিতি দখল করে নেবে গোটা দুনিয়া!' কথাগুলো যেন আর কেউ তাকে দিয়ে বলিয়ে নিচ্ছে। তারপর খিলখিল করে হাসতে শুরু করল ডোনা, হাসির শব্দটাও যেন অনেক দূর থেকে ভেসে এল বলে

মনে হলো রানার। হাসি নয়, শাকচুন্নির উল্লাস, ভয় পেয়ে এক পা পিছিয়ে গেল নার্স আর ডাক্তার। 'সত্য সমিতির জয় হবে!' তারপর প্রথমবারের মত, উন্মুক্ত হলো চোখ দুটো। বিস্ফারিত চোখ, কিন্তু কারও বা কোন দিকে যেন তাকিয়ে নেই। চোখ ভরা আতঙ্ক আর ভয়। রানার মনে হলো, ডোনা এমন কিছু দেখতে পাচ্ছে যা দেখার সাধ্য আর কারও নেই, অথচ জিনিসটা এখানে, এই বেডরূমেই আছে। আবার সেই রোমহর্ষক হাসির শব্দ হলো। হাসির আওয়াজের সাথেই বেরিয়ে এল কথাগুলো, 'বাবাদের রক্ত ছেলেদের ওপর ঝরবে!' আবার সেই একই অনুভূতি হলো রানার, ডোনার গলা থেকে অন্য কেউ কথা বলছে।
ওদের পিছনে ফুঁপিয়ে উঠলেন লেডি চেস্টারফিল্ড।

ছয়

কামরার ভেতর আধিভৌতিক একটা পরিবেশ। পরিস্থিতিটা যুক্তি দিয়ে বিবেচনা করার চেষ্টা করল রানা। সুন্দরী একটা মেয়ে অসুস্থ অবস্থায় এমন সুরে এমন সব কথা বলছে, যেন অন্য কোন গ্রহের প্রাণী সে। যুক্তিগ্রাহ্য একটা ব্যাখ্যা থাকতেই হবে। রানা উপলব্ধি করল, অবসাদ আর ক্লান্তি দূর হয়ে গেছে তার, ডোনার মানসিক অবস্থার সম্ভাব্য কারণ খুঁজে পাবার চেষ্টা করছে সে।

দীর্ঘ পদক্ষেপে ডাক্তারের সামনে গিয়ে দাঁড়াল ও, শক্ত হাত রাখল তাঁর কাঁধে, নিজের দিকে ফেরাল তাঁকে, নিচু গলায় বলল,

'আপনার সাথে একা একটু আলাপ করতে পারি, প্লীজ?'

হতভম্ব চোখে তাকালেন ডাক্তার, তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে কি যেন খুঁজলেন রানার মুখে, তারপর অনিচ্ছাসত্ত্বেও মাথা ঝাঁকালেন। ডাক্তারকে নিয়ে কামরা থেকে বেরিয়ে এল রানা, বারান্দার এক কোণে তাঁকে দাঁড় করাল। 'আপনি যে বিশেষজ্ঞ ভদ্রলোককে ডেকেছেন...' শুরু করল ও।

'ইয়েস?'

'কে তিনি?'

'আগেও বহুবার ভদ্রলোকের সাহায্য নিয়েছি আমি।' সম্ভবত রোগিণীর অনুপস্থিতিতে আগের চেয়ে স্বস্তিবোধ করছেন তরুণ ডাক্তার। উদ্বেগের বদলে তাঁর চেহারায় আত্মবিশ্বাস ফিরে এল। 'প্রফেসর টমসন, নাম করা বিশেষজ্ঞ।'

'কিসে বিশেষজ্ঞ তিনি?'

'ড্রাগ, অ্যালকোহল আর অ্যাডিকশন...'

'সত্যি আপনি মনে করেন, নেশা করার ফলে এই অবস্থা হয়েছে মেয়েটার?'

'মি. রানা,' ডাক্তার আহত কণ্ঠে বললেন, 'ডোনার একটা ইতিহাস আছে। আমার ধারণা, এদিকটা আপনি প্রফেশন্যালদের হাতে ছেড়ে দিলে ভাল করবেন।'

'ওখানে যা দেখলাম, তারপরও?' ইঙ্গিতে বেডরুমটা দেখাল রানা। 'প্রশ্নটা আবার করছি আমি, সত্যি কি আপনি মনে করেন, ডিটক্স ক্লিনিকে চিকিৎসা হওয়া দরকার ডোনা চেস্টারফিল্ডের?'

'তারচেয়ে ভাল কোন পরামর্শ দিতে পারেন আপনি?' পাল্টা

প্রশ্ন করলেন ডাক্তার, চ্যালেঞ্জের সুরে।

'অ্যাজ এ ম্যাটার অভ ফ্যাক্ট, ইয়েস।'

'আই সী। আপনি কি তাহলে একজন চিকিৎসকও, মি. রানা?'

'না। তবে এমন এক পেশায় আছি, যে পেশায় নাম লেখাতে হলে মানুষের শরীর ও মন সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা থাকতেই হবে। রোগিণীকে দেখে এ-কথা আপনার মনে হয়নি, যতটা না নেশার কারণে, তারচেয়ে বেশি মতিভ্রমজনিত ও সম্মোহনজনিত কারণে এই অবস্থা হয়েছে তার?'

'হতে পারে।' ডাক্তারের কথার সুরে রানাকে সমর্থন করার কোন লক্ষণ প্রকাশ পেল না। 'তা যদি হয়ও এটাকে আপনার ড্রাগ প্রবলেমই বলতে হবে। প্রথম কাজ নেশা ভাঙানো। নেশা ছুটে গেলে রোগিণী তার স্বাভাবিক বোধবুদ্ধি ফিরে পাবে।'

'ব্যাপারটাকে আরও একটু জটিল বলে মনে হচ্ছে না আপনার, ডাক্তার? মেয়েটার অবচেতন মনের নরম অংশে খোঁচাখুঁচি করা হয়েছে, সালফোনাল, এল এস ডি বা এ-ধরনের অন্য কোন ড্রাগের সাহায্যে প্রভাবিত করার পর। আত্মাটা তার কাছ থেকে কেড়ে নেয়া হয়েছে। আমার তো মনে হচ্ছে, নেশা ছোটানোর চিকিৎসা নয়, আরও বড় ধরনের সাহায্য দরকার তার।'

'দেখা যাবে। প্রফেসর টমসন না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করুন।'

'না, ডাক্তার সাহেব, আমি দুঃখিত। আমি বা পুলিস সুপার যাঁদের প্রতিনিধিত্ব করছি, তাঁরা অনুমতি দেবেন না।' জেদের

কঠিন রেখাগুলো স্থির হয়ে আছে রানার চেহারায়। 'আমাকে আমার ডিরেক্টরের কাছ থেকে নির্দেশ নিতে হবে, তার আগে খুব খুশি হব আপনি যদি আপনার রোগিণীকে কোথাও না সরান। আমি চাই না একটা অ্যাম্বুলেন্স এসে ডোনা চেস্টারফিল্ডকে প্রফেসর টমসনের ক্লিনিকে নিয়ে যাক।'

'এ আপনি কি বলছেন? আমার রোগিণীকে আপনি...'

'আপনার রোগিণীকে আমি আটকাতে পারি না, এই তো? নিজের চোখেই দেখতে পাবেন, পারি।' কথা না বাড়িয়ে হলরুম হয়ে বাড়ির সামনে বেরিয়ে এল রানা, ইউনিফর্ম পরা পুলিসকে কাছে ডেকে নির্দেশ দিল, পরবর্তী নির্দেশ না পেলে বাড়ির ভেতর কাউকে ঢুকতে দেয়া যাবে না। এমন কি কোন অ্যাম্বুলেন্স বা ডাক্তারও ভেতরে ঢুকতে পারবে না। মাথা ঝাঁকিয়ে নির্দেশটা গ্রহণ করল পুলিস। রানাকে পুলিস সুপারের সাথে বাড়ির ভেতর ঢুকতে দেখেছে সে, নির্দেশটা ওপরমহলের বলেই ধরে নিল।

হলরুমে ফিরে এসে টেলিফোনের রিসিভার তুলল রানা। মারভিন লংফেলোর ব্যক্তিগত নম্বরে ডায়াল করল।

সাথে সাথে সাড়া দিলেন বি. এস. এস. চীফ, কণ্ঠস্বর চিনতে পেরে বললেন, 'কি খবর?'

'জানি লাইনটা নিরাপদ নয়–কিন্তু সময় খুব কম, মি. লংফেলো,' বলল রানা। 'দ্রুত অ্যাকশন নিতে হবে আমাদের।'

'বলে যাও,' তাগাদা দিলেন মারভিন লংফেলো।

'আমাদের খাতায় সেই ওঝা ভদ্রলোকের নাম কি এখনও আছে, স্যার?'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন বি.এস. এস. চীফ। 'মিস্টার এম.

আর. নাইন, আমি চাই না এ-ধরনের স্ল্যাং ব্যবহার করো তুমি! ভদ্রলোক অত্যন্ত দক্ষ নিউরোলজিস্ট। উত্তরটা হলো, হ্যাঁ। দরকার হলেই তাঁকে ডাকতে পারি আমরা। তাঁর ক্লিনিকও ব্যবহার করতে পারি। তবে, শুধু অত্যন্ত জরুরী প্রয়োজনে।' একটু বিরতি নিয়ে গম্ভীর সুরে যোগ করলেন, 'মনে করার কোন কারণ নেই যে তাঁকে আমরা বাদ দিয়েছি। কেন জানতে চাইছ?'

মনে মনে একচোট হাসল রানা। প্রফেসর ওয়েদারবাইকে নিজেই তিনি ওঝা বলে সম্বোধন করেছেন, নিজের কানে শুনেছে ও বহুবার।

রানার কথা শেষ হতে মারভিন লংফেলো বললেন, 'বুঝতে পারছি। ঠিক আছে। কিন্তু প্রথমে লর্ড চেস্টারফিল্ডের সাথে কথা বলে নাও। কোন অবস্থাতেই হাউজফিজিশিয়ানকে অপমান করা চলবে না। নিশ্চিত হও, তাঁকে যেন বাড়ির কর্তা বিদায় দেন।'

'জ্বী।'

'ওঝ্...ওয়েদারবাইয়ের সাথে কথা বলছি আমি,' জানালেন মারভিন লংফেলো। 'রোগিণীকে আমাদের একটা ইউনিট বাড়ি থেকে তুলে নেবে। খুব বেশি হলে আধ ঘণ্টার মধ্যে একটা অ্যাম্বুলেন্স পৌঁছুবে ওখানে। আজকের কোড জানিয়ে দিও ওদেরকে।'

রিসিভার নামিয়ে রাখল রানা। বি.এস.এস-কে আগেও বহুবার সাহায্য করেছেন প্রফেসর ওয়েদারবাই। তিনিই সম্ভবত বর্তমান দুনিয়ার সবচেয়ে নামকরা নিউরোলজিস্ট। মারভিন লংফেলোর কাছে শুনেছে রানা, নোবেল প্রাইজের জন্যে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছিল তাঁকে। তাঁর লেখা একটা বই সংশ্লিষ্ট চিকিৎসক

মহলে আলোড়ন তুলেছে, বইটার নাম ‘সাম সাইকোসোমাটিক সাইড-এফেক্টস অভ অর্গানিক ইনফিরিওরিটি’। বেশ কিছুদিন আগে রানারও একবার চিকিৎসা করেছেন ভদ্রলোক—একটা ইঞ্জেকশনের পর ও যখন মানসিক বিপর্যয়ের শিকার হয়ে পড়েছিল।

ডোনার বেডরূমে ফিরে এল রানা। মেয়ের পাশ থেকে বাপকে সরিয়ে আনল, তাঁর আগে এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকল বিছানার পাশে। সম্পূর্ণ শান্ত হয়ে ঘুমিয়ে রয়েছে ডোনা, দেখে মনেই হয় না খানিক আগে ঘোরের মধ্যে রোমহর্ষক প্রলাপ বকছিল মেয়েটি। নিয়মিত নিঃশ্বাস ফেলছে, চাদরের নিচে উঁচু-নিচু হচ্ছে বুক। তার মুখের দিকে নিশ্চলক তাকিয়ে থেকে ভাবল রানা, সুস্থ ও পরিপাটি অবস্থায় মেয়েটার রূপ নিশ্চয়ই চোখ ধাঁধিয়ে দেবে। অবশ্য শুধু নীরোগ শরীর নয়, মানসিক সুস্থতাও থাকতে হবে।

হলরূমে লর্ড চেস্টারফিল্ডের মুখোমুখি হলো রানা। মারভিন লংফেলোর সাথে ওর টেলিফোন আলাপের সারমর্ম ব্যাখ্যা করল ও, সবশেষে বলল, ‘আপনার বন্ধু চাইছেন, ডোনাকে প্রফেসর ওয়েদারবাইয়ের ক্লিনিকে এখুনি পাঠিয়ে দেয়া হোক। নাদিরা রহমানের ভাগ্যে কি ঘটেছে আমরা জানি, কাজেই কোন ঝুঁকি নিতে চাই না। ডোনার মনের যে অবস্থা, প্রফেসর ওয়েদারবাইয়ের ক্লিনিকেই শুধু তার ভাল চিকিৎসা হতে পারে। আপনিও নিশ্চয়ই তাই চান?’

কয়েকবার মাথা ঝাঁকালেন লর্ড চেস্টারফিল্ড। ‘চাই বৈকি, অবশ্যই চাই। মারভিন যদি বলে থাকে, তর্ক করার আমি কে?

এখুনি ডাক্তারকে আমি বিদায় করে দিচ্ছি।’

কয়েক মিনিট পর হলরুম হয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলেন ডাক্তার ডানিয়েল, যাবার পথে রানার দিকে কটমট করে তাকালেন, মনে হলো রেগে বোম হয়ে আছেন।

পঁচিশ মিনিটের মাথায় বি.এস. এস. মেডিকেল টীম পৌঁছুল, অ্যাম্বুলেন্স নিয়ে। অ্যাম্বুলেন্সের আগে আগে এল দু’জন মোটরসাইকেল আরোহী, দু’জনের চোখেই রঙিন চশমা। বেডরুম থেকে বের করে এনে ডোনাকে অ্যাম্বুলেন্সে তুলতে মিনিট তিনেক লাগল। রানার কাছ থেকে আজকের কোড ওয়ার্ড জেনে নিয়ে রওনা হয়ে গেল মেডিকেল টীম। গন্তব্য বি.এস.এস-এর নিরাপদ ক্লিনিক, গিল্ডফোর্ড-এর কাছে, সারে-তে।

ভোর তিনটের দিকে হেডকোয়ার্টারে ফিরে এল রানা। ওকে একটা ক্যাম্প খাটে শুয়ে পড়তে বললেন মারভিন লংফেলো, সাধারণত ডিউটি অফিসার ব্যবহার করে ওটা। আজ রাতে অত্যন্ত ব্যস্ত রয়েছেন ভদ্রলোক। ‘সকালে,’ বি.এস.এস. চীফ ওকে বললেন, ‘পীর হিকমতের ফাইলটা পড়ে নিও, তারপর অ্যাভং কার্ট অফিসটা একবার দেখে আসবে।’ রানাকে অবাক হতে দেখে ক্ষীণ, দুর্লভ হাসি ফুটল তাঁর ঠোঁটে। ‘আমরা চুপচাপ এক জায়গায় দাঁড়িয়ে নেই যে পায়ের তলায় ঘাস গজাবে। ক্রেডিট কার্ড অপারেশন কোন্ ঠিকানা থেকে পরিচালনা করা হয়, জানতে পেরেছি।’ রানাকে তিনি জানালেন, সার্জেন্ট বিল রেম্যানের সাথেও দেখা হয়েছে তাঁর। ‘চটপটে, স্মার্ট লোক। ভোরের আলো ফুটলেই প্যাঙবোর্নের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে যাবে সে।’ আরও জানালেন, সংবাদ মাধ্যমকে নাদিরা রহমানের মৃত্যুর

খবর দেয়া হয়েছে, সে যে সত্য সমিতির একজন সদস্যা ছিল তা-ও গোপন করা হয়নি, গোপন করা হয়নি সত্যবাবাকে তার চাঁদা দেয়ার কথাটাও। 'মৌমাছির চাকে ঢিল ছোঁড়ার কাজ করবে ব্যাপারটা,' বললেন তিনি। 'আমাদের সমাজে সাংবাদিকরা অনেক ক্ষেত্রে ডিটেকটিভের দায়িত্ব পালন করেন।' ইঙ্গিতে দরজাটা দেখিয়ে দিলেন তিনি। 'ঘুমিয়ে নাও, রানা। ছ'টার দিকে তোমাকে আমার দরকার হবে। সকাল সকাল শুরু করলে কাজকর্ম ভাল এগোয়। গুডনাইট, স্লীপ ওয়েল।'

স্বপ্নে বিশাল একটা মন্দির দেখল রানা। মন্দিরের ভেতর সাদা আলখেল্লায় আপাদমস্তক ঢাকা একজন উপাসককে দেখা গেল, দুর্বোধ্য মন্ত্র উচ্চারণ করছে। মন্দিরের ভেতর, মাঝখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে রানা। ঘাড় ফেরাতে দেখতে পেল, কয়েকজন লোক ধরাধরি করে একটা মেয়েকে নিয়ে আসছে। কালো মার্বেল পাথরের তৈরি বেদীর ওপর তোলা হলো মেয়েটাকে। পাথরের সাথে বাঁধা হলো। লোকগুলো পিছিয়ে এসে পথ করে দিল প্রকাণ্ড কুৎসিত একটা পোকাকে। গুটি গুটি এগোল পোকাটা। এই সময় হঠাৎ উপলব্ধি করল রানা, ওটা কৃত্রিম পোকা, লোহার তৈরি, রিমোট কন্ট্রোলে চলে। পোকার লেজের দিকটা কামান আকৃতির, হাঁ করে আছে কামানের কালো মুখ। সামনের দিকটা মশার মাথা আকৃতির, তবে হুল রয়েছে একজোড়া।

বেদীর ওপর ছটফট করছে মেয়েটা, তার গলা চিরে আর্তচিৎকার বেরিয়ে আসছে।

পূজারির মন্ত্র উচ্চারণের আওয়াজ ক্রমশ বাড়ছে, 'গে-গে-গে-গে...' তারপর, আবার ঘাড় ফেরাতে, রানা দেখল, মেয়েটা

পুরুষে রূপান্তরিত হয়েছে। লোকটা তার আতঙ্ক ভরা চোখ তুলে অপেক্ষারত উপাসকের দিকে তাকাল, এইসময় চমকে উঠে উপলব্ধি করল রানা, উপাসক আর কেউ নয়, ও নিজে। ইস্পাতের তৈরি একজোড়া দীর্ঘ, ধারাল হুল এগিয়ে আসছে, 'গে-গে-গে-গে...'

'গেটআপ, মি. রানা।' বেলি পিটজেরাল্ড, বি.এস.এস.-এর দুর্ধর্ষ এজেন্টদের অন্যতম, রানার কাঁধে মৃদু ধাক্কা দিল, 'উঠে পড়ুন, স্যার। বস্ আপনার জন্যে অপেক্ষা করছেন।'

রানা বুঝতে পারল, জেগে আছে ও, দরদর করে ঘামছে। দুঃস্বপ্নটা অম্লান আর বাস্তব লাগছে এখনও। 'তুমি?' অনিবার্য এবং গোপন একটা কারণে এক বছর হলো কোন অ্যাসাইনমেন্টে পাঠানো হয় না বেলিকে, রানার প্রাইভেট সেক্রেটারি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছে সে। রানা হেরিফোর্ডে চলে যাবার পর ছুটিতে ছিল।

'ভোর রাতে আমার ছুটি বাতিল করা হয়েছে, স্যার,' বলল বেলি। সদ্য শাওয়ার আর মেকআপ সেরে এসেছে সে, ডিম্বাকৃতি অবয়ব তাজা ফুলের মতই সুন্দর। 'বস্ নিজে আমাকে ডেকে বললেন, আমি যেন আপনার ওপর একটু নজর রাখি।'

'মি. লংফেলো বলেছেন আমার ওপর নজর রাখতে?' নজর শব্দটার ওপর জোর দিল রানা, তারপর হেসে উঠল।

কি ভেবে কে জানে, লালচে হয়ে উঠল বেলি ফিটজেরাল্ডের চেহারা। তাড়াতাড়ি পিছিয়ে গিয়ে টেবিল থেকে একটা ট্রে তুলে আনল সে। 'নিন, স্যার, আপনার কফি—ঠিক যেভাবে আপনি পছন্দ করেন।'

কাপটা তুলে নিয়ে ছোট্ট করে চুমুক দিল রানা। 'ধন্যবাদ।'

'বাথরূমটা আপনার জন্যে খালি রাখা হয়েছে, স্যার,' বলল বেলি। 'দক্ষিণের একটা ব্যালকনির দরজা খুলে রেখেছি, ভাবলাম যদি এক্সারসাইজ করেন...'

'মি. লংফেলো আমার সাথে...'

রানার প্রশ্ন শেষ হলো না, উত্তরটা যেন ঠোঁটে ঝুলছিল বেলির, 'উনি আপনার সাথে ঠিক সাড়ে ছ'টার সময় বসবেন, স্যার।'

আরেকবার ধন্যবাদ দিয়ে বাথরূম সেরে ঝুল-বারান্দায় চলে এল রানা, ব্যায়াম ইত্যাদি সেরে আবার ফিরে এল বাথরূমে। প্রথমে গরম, তারপর ঠাণ্ডা পানিতে শাওয়ার সারল, দাড়ি কামাল, বেলির দেয়া নতুন একটা স্যুট পরে ঠিক সাড়ে ছ'টার সময় হাজির হলো মারভিন লংফেলোর অ্যান্টিরূমে। রাতটা অফিসেই কাটিয়েছে এলিজাবেথ, রানার আধ ঘণ্টা আগে ঘুম থেকে উঠেছে। তার ডেস্কের ওপর দুটো কমপিউটর, জটিল টেলিফোন/ইন্টারকম ইউনিট ইত্যাদি রয়েছে। রানাকে দেখে চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়ল সে, হ্যান্ডশেক করল, বলল, 'ভাল ঘুম হয়েছে তো?'

স্মিত হেসে ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকাল রানা। 'তোমার?'

'স্বপ্ন দেখাটা ঘুমের মধ্যে পড়ে কিনা জানি না,' আড়ষ্ট হাসি নিয়ে বলল লিজা। 'যতক্ষণ চোখ বন্ধ ছিল, শুধু একটা চেহারা দেখতে পেয়েছি–তাকে অবশ্য ভারি পছন্দ করি আমি।'

কে সে?–জিজ্ঞেস করতে গিয়েও নিজেকে সামলে নিল রানা।

মৃদু হেসে ইন্টারকমের দিকে ইঙ্গিত করল ও।

তাড়াতাড়ি সুইচ অন করে রিসিভার তুলল লিজা, বলল, 'স্যার, মি. মাসুদ রানা।'

'পাঠিয়ে দাও ওকে, লিজা,' ভারি, কর্তৃত্বপূর্ণ কণ্ঠে বললেন মারভিন লংফেলো।

দরজার দিকে এগোল রানা, দেখল চেম্বারের মাথায় আলো জ্বলে উঠল।

বোঝাই যায়, রাতটা অফিসেই কাটিয়েছেন বি.এস.এস. চীফ। চেম্বারের ভেতর একটা ক্যাম্প বেড রয়েছে, দেয়াল ঘেঁষে। ফুলহাতা শার্ট পরে আছেন তিনি, চোখের চশমাটা নাকের ডগায় নেমে এসেছে, টাইয়ের নটটা কাত হয়ে রয়েছে একদিকে। রানার সাথে হ্যান্ডশেক করে বসতে অনুরোধ করলেন। কাগজ-পত্র গোছগাছ করতে দু'মিনিট সময় চেয়ে নিলেন তিনি। চেহারায় গভীর মনোযোগ। তারপর মুখ তুলে জানতে চাইলেন, 'শরীর কেমন, রানা? ক্লান্তি খানিকটা দূর হয়েছে তো?'

'ধন্যবাদ, মি. লংফেলো। ভালই লাগছে।'

'আজ সকালে প্রথম কাজ কি তোমার?' জানতে চাইলেন বি.এস.এস. চীফ।

'পীর বাগদাদীর ফাইলটা...'

'একচল্লিশ নম্বর কামরায় রাখার ব্যবস্থা করেছি ওটা,' রানাকে বাধা দিয়ে বললেন মারভিন লংফেলো। 'কাল রাতে রকসনও তার কাগজ-পত্র দিয়ে গেছে, একই ফাইলে পাবে সব। কসমিক, কাজেই দরজায় একজন গার্ড দেখতে পাবে তুমি। লেখার সমস্ত সরঞ্জাম তার কাছে রেখে যেতে হবে তোমাকে—কলম, নোটবুক

ডায়রী ইত্যাদি। বিশ্বাস করা না করার প্রশ্ন নয়–তুমি জানো, নিয়ম।'

রানা জানে। জিজ্ঞেস করল, 'সার্জেন্ট বিল রেম্যানকে কেমন মনে হলো আপনার?'

'দেখে তো কাজের লোক বলেই মনে হলো।' হাতঘড়ির দিকে তাকালেন মারভিন লংফেলো। 'প্যাঙবোর্নের পথে রয়েছে সে, সাথে একদল এস.বি–র লোক।'

'ডোনা চেস্টারফিল্ডের কোন খবর পেয়েছেন, মি. লংফেলো?'

'ডোনার কি খবর?'

'তার অবস্থা সম্পর্কে নতুন কিছু?'

'উম্‌ম্‌। না, তার অবস্থা বিশেষ সুবিধের নয়। প্রফেসর ওয়েদারবাই আমাকে বললেন, ড্রাগের নেশাটা কাটিয়ে উঠবে ডোনা। কেউ মারাত্মক একটা ডোজ খাইয়ে দিয়েছে। প্রফেসর আসলে তার মানসিক অবস্থা নিয়ে চিন্তিত।'

'প্রথমে ড্রাগের সাহায্যে তার মনটাকে দুর্বল করা হয়, তারপর দুর্বল মনে কিছু সাজেশন গছিয়ে বা চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে?' নিজের ধারণাটা সত্যি কিনা জানার ব্যগ্রতা রয়েছে রানার ভেতর।

'অনেকটা সেরকমই। একচল্লিশ নম্বর কামরা, মাই বয়। ফাইলটা শেষ করে তাড়াতাড়ি ফিরে এসো এখানে। অনেক কাজ বাকি পড়ে রয়েছে।'

উঠতে যাবে রানা, মুখ তুলে মারভিন লংফেলো বললেন, 'দুটো অ্যাভং কার্টই ল্যাবরেটরিতে পাঠিয়ে দিয়েছি। টেকনিশিয়ানরা পরীক্ষা করছে ওগুলো।' তারমানে, ভাবল রানা,

বি.এস.এস-এর আগ্নেয়াস্ত্র ও ইলেকট্রনিক এক্সপার্ট জেসমিনের ঘাড়ে পড়েছে কাজটা।

মারভিন লংফেলোর চেম্বার থেকে বেরিয়ে সাততলায় উঠে এল রানা, একচল্লিশ নম্বর কামরাটা এখানেই। অ্যাভং কার্ট-এর কথা মনে পড়ল ওর, কে জানে ল্যাবরেটরি টেস্টে কি পাওয়া যাবে।

সাততলায় অনেকগুলো প্যাসেজ আর করিডর, প্রতিটির দু'পাশে সার সার দরজা। প্রতিটি করিডর বা প্যাসেজের দরজায় আলাদা আলাদা রঙ ব্যবহার করা হয়েছে। কোন বিশেষ তাৎপর্য বা সঙ্কেত খুঁজতে যাওয়া বৃথা, সাদামাঠা কারণটা হলো মেইন্টেন্যান্স সেকশনের রঙমিস্ত্রীরা একটা কালার চার্ট ধরে কাজ করেছে, লাল রঙ শেষ হয়ে যাওয়ায় নীল বা অন্য রঙ ব্যবহার করেছে তারা। বি.এস.এস. করিডরের ডাক নামও আছে—যেমন, লাল করিডর, সবুজ করিডর, ইত্যাদি।

একচল্লিশ নম্বর কামরার দরজা গোলাপী রঙের। দরজায় দাঁড়িয়ে আছে যেন মি. ইংল্যান্ড, মারমুখো চেহারা নিয়ে, ভাবটা যেন প্রাণ হারাতেও রাজি, তবু কাউকে ভেতরে ঢুকতে দেবে না। যদিও রানাকে ভাল করে চেনে লোকটা, তারপরও পরিচয়-পত্র দেখার জন্যে জেদ ধরল। অত্যন্ত উৎসাহের সাথে রানাকে সার্চ করল সে, লেখার বা কপি করার কোন সরঞ্জাম পাওয়া যায় কিনা দেখার জন্যে। কামরার ভেতর একটা চেয়ার, টেবিলের ওপর পড়ে রয়েছে মোটাসোটা ফাইলটা। চেয়ারে বসে ফাইলের শিরোনাম পড়ল রানা। 'ব্যাংক'। পীর বাবা হযরত হিকমত বাগদাদী রহমতউল্লাহ হুজুরের সাঙ্কেতিক নাম, মানিয়েছে বটে।

ফাইল খুলে পড়ায় মন দিল ও।

ফাইলের বেশিরভাগ কাগজ অনেকদিনের পুরানো, আগেও পড়েছে রানা– রহস্যময় চরিত্র সম্পর্কে অপর্যাপ্ত, খুঁটিনাটি তথ্য। হিকমত বাগদাদী আদৌ ইরাকী নয়, তার জন্ম ইংল্যান্ডে, ছোট্ট শহর গ্লাসটনবারিতে। তবে তার বাবা ইংল্যান্ডে আসে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান থেকে। শোনা যায়, প্রথম জীবনে পাঁড় কমিউনিস্ট ছিল হিকমত। আনুষ্ঠানিকভাবে খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করে। নতুন একটা ধর্ম প্রচার শুরু করার আগে নিজেকে একজন নও-মুসলিম বলে দাবি করত সে।

পীর হিকমত সম্পর্কে প্রথম জানা যায় বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়। মুক্তিযোদ্ধার ভুয়া পরিচয় দিয়ে সীমান্ত এলাকায় ঘোরাফেরা করতে দেখা গেছে তাকে, উদ্দেশ্য ছিল স্বাধীনতাবিরোধী শক্তিকে অস্ত্র যোগান দেয়া। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর হঠাৎ গায়েব হয়ে যায় সে। দু'বছর পর আবার তাকে রাজধানী ও জেলা শহরগুলোয় দেখা যায়, সন্ত্রাসী মাস্তানদের কাছে আগ্নেয়াস্ত্র বিক্রি ছিল তার প্রধান কাজ। দেশের নিরক্ষর, ধর্মপ্রাণ মানুষের কাছে তার জনপ্রিয়তা ক্রমশ বাড়তে থাকে। প্রত্যন্ত গ্রামগুলোয় ওয়াজ-মাহফিলের আয়োজন করে তার ভক্তরা, সেখানে জ্বালাময়ী ভাষণ দেয় পীর হিকমত–মেয়েরা বাইরে বেরুলে ধর্ম রসাতলে যাবে, প্রাইমারি স্কুলগুলোকে মাদ্রাসায় রূপান্তরিত করা উচিত, ইসলামের ওপর আগ্রাসন বন্ধ করার জন্যে প্রতিটি মুসলমানকে জেহাদ করতে হবে, একুশে ফেব্রুয়ারির অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করলে তাকে কাফের বলে চিহ্নিত করতে হবে, এই সব বলে বেড়াত সে। বছর দুয়েক পর একদল

যুবকের তাড়া খেয়ে দেশ ছেড়ে পালিয়ে যায় পীর হিকমত।

এরপর তার খবর পাওয়া যায় ইউরোপ আর মধ্যপ্রাচ্য থেকে। ইতোমধ্যে কুখ্যাত আন্তর্জাতিক স্মাগলার হয়ে উঠেছে লোকটা, টেরোরিস্ট গ্রুপগুলোকে চড়া দামে অস্ত্র ও গোলাবারুদ সরবরাহ করে। পাতার পর পাতা জুড়ে রয়েছে তার সরবরাহ করা অস্ত্রের তালিকা–রাইফেল, হ্যান্ডগান, অ্যামুনিশন, গ্রেনেড, জেলিগনাইট, ফিউজ, ডিটোনেটর, মিসাইল লঞ্চার ছাড়াও সফিসটিকেটেড অন্যান্য আরও অনেক যুদ্ধাস্ত্র বিক্রি করেছে সে, কিন্তু এগুলোর কোনটাই সূত্র হিসেবে কাজে আসেনি, নিঃসন্দেহে প্রমাণ করা সম্ভব হয়নি জিনিসগুলো পীর হিকমতের কাছ থেকে এসেছে। তবে আন্ডারগ্রাউন্ডের প্রভাবশালী লীডাররা ব্যাপারটা জানে। যদিও, তাদের কাছেও, পীর হিকমত একটা রহস্যময় চরিত্র। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন একাধিক ইনভেস্টিগেটিং ফার্ম তার ব্যবসা ও অবৈধ লেনদেন সম্পর্কে তদন্ত চালিয়েছে, কিন্তু নিরেট কোন প্রমাণ বা বিশ্বাসযোগ্য কোন সাক্ষী যোগাড় করতে পারেনি।

বাস্তব তথ্যের ওপর মনোযোগ দিল রানা, লোকটা সম্পর্কে জানা ঘটনা কি কি রয়েছে। সবচেয়ে আগে যেটা চোখে পড়ে, পীর হিকমত চরম নিষ্ঠুর লোক। গত বিশ বছরে অন্তত ষোলোজন লোক তার সাথে বেঈমানী করার সুযোগ পেয়েছিল, সবাই তারা অপঘাতে মারা গেছে–চারজন অবিশ্বাস্য সড়ক দুর্ঘটনায়, তিনজন অজ্ঞাত আততায়ীর গুলিতে, চারজন বিষক্রিয়ায়, দু'জনের বেলায় আত্মহত্যা বলে সন্দেহ করা হয়, দু'জন তথাকথিত গুণ্ডাদের হাতে বেদম মার খেয়ে, বাকি একজন

একটা মোটেলের বাথটাবে ডুবে মারা গেছে। ফাইলে দেখা যাচ্ছে, পীর হিকমতের কর্মচারী ছিল বলে সন্দেহ হয় এমন আরও বিশজন লোক হয় সরাসরি খুন হয়েছে, নয়তো তাদের মৃত্যুকে আত্মহত্যা হলে চালাবার চেষ্টা হয়েছে। সদ্ভাব বজায় রেখে লোকটার সাথে কাজ করতে চাওয়া মোটেও স্বাস্থ্যসম্মত নয়।

তারপর চোখে পড়ে, লোকটা লম্পট ও ভণ্ড। সত্তর দশকের শেষ দিকটা সে তার সুন্দরী ও অল্পবয়েসী ফরাসী স্ত্রী পলি মিঁতার সাথে দুশো আশি ফুট লম্বা সমুদ্রগামী ইয়ট মিল্কিওয়ে/ওয়ান-এ কাটায়। তিন হাজার অশ্বশক্তির ডিজেল এঞ্জিনে চলে সেটা। একটা ব্যাপারে অদ্ভুত লাগল রানার, পশ্চিমা সংবাদিকরা অভিজাত ও ধনী দম্পতিদের গোপন বিলাসিতা সম্পর্কে খবর সংগ্রহে দক্ষ হলেও, মিল্কিওয়ে বা তার আরোহীদের সম্পর্কে তেমন কোন খবর সংগ্রহ করতে পারেনি। একাধিক টেলিফোন সাক্ষাৎকারের খবর ছাপা হয়েছে বিভিন্ন পত্রিকায়, কাটিংগুলো ফাইলে পাওয়া গেল। সাক্ষাৎকারে পীর হিকমত গর্বের সাথে জোর দিয়ে বলেছে, জাগতিক ব্যাপারে তার কোন আগ্রহ নেই, তার সময় কাটে আধ্যাত্মিক সাধনায়, ধ্যানমগ্ন অবস্থায়। তবে, সংবাদিকরা কিছু গুজবের কথা উল্লেখ করেছে—তার ইয়টে নাকি ইহুদি ও মিশরীয় বেলী ড্যান্সাররা নিয়মিত আসর জমাত, লাস ভেগাস থেকে আসত নাম করা ক্যাবারে ড্যান্সাররা। শোনা যায়, রোজ রাতে নতুন মেয়ে না হলে পীর সাহেবের মেজাজ শরীফ ঠিক থাকে না। তার ইয়টে ও ইয়টের আশপাশে সশস্ত্র গার্ডরা পাহারায় থাকে। ইয়টে চড়া তো দূরের কথা, আজ পর্যন্ত কোন ফটো-সাংবাদিক মিল্কিওয়ের ভাল কোন ছবিও তুলতে পারেনি।

সাংবাদিকরা ব্যর্থ হলেও, কয়েকটা ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি আংশিক সফলতা অর্জন করে। ফাইলে কিছু ফটোগ্রাফ রয়েছে, সবই নিকৃষ্ট শ্রেণীর, একটা বাদে। সি.আই.এ-র একজন এজেন্ট ভাগ্যগুণে একটা সুযোগ পেয়ে যায় উনিশশো আশি সালে। মিল্কিওয়ে তখন ফ্লোরিডায় নোঙর ফেলেছে। একটা বাড়ির জানালা থেকে ইনফ্রা-রেড ক্যামেরার সাহায্যে ছবিটা তোলে সে।

নরম, ফোলা ও তেল চকচকে একটা ভাব রয়েছে পীর হিকমতের চেহারায়। এক সময় সুদর্শন ছিল বলে মনে হয়, চোয়ালে মাংস আর চর্বি জমায় অবয়ব বেঢপ হয়ে গেছে। মাথার সামনের চুলগুলো সাদা, পিছনে ও দু'পাশে সাদা কালো মেশানো। নাকটা রোমানদের মত। ছবিটায় মাথা একদিকে কাত করে ডেকের ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছে পীর হিকমত, ভঙ্গিটা থেকে ফুটে বেরুচ্ছে একই সাথে দম্ভ ও তাচ্ছিল্যের ভাব। সান্ধ্যকালীন ইউরোপিয়ান পোশাক, সাদা টক্সেডো পরে আছে সে, বাঁ হাতে প্রকাণ্ড রিস্টওয়াচ, ডান হাতে সোনার চেইন। চোখ দুটো ঢুলুঢুলু, যেন নেশা করেছে।

ফটোগ্রাফের নিচে কিছু নোট রয়েছে–স্থান ও সময়, অলঙ্কারের আনুমানিক মূল্য, সোনার চেইনের গায়ে খুদে হরফে লেখা আছে পীর হিকমতের পুরো নাম, নামের পাশে কিছু সংখ্যাও খোদাই করা আছে, ক্যামেরায় যা ধরা পড়েনি। হাতঘড়িটা খাঁটি সোনার, হাতে তৈরি ডিজিটাল টাইমপীস, ডায়ালের সংখ্যাগুলো নিখুঁত হীরার। ঘড়িটা তৈরি করেছে সুবিখ্যাত একজন জাপানী কারিগর, শুধু এই কারণে ওটার দাম এক লাখ ডলারের কম হবে না। এই আকৃতির হাতঘড়ি এই

একটাই তৈরি করা হয়েছে।

উনিশশো বিরাশি সালে পলি মিঁতা মারা যায়। মৃত্যুর কারণ হিসেবে বলা হয়েছে, সাগরে দুর্ঘটনা। এই ঘটনার পরপরই আবার গায়েব হয়ে যায় পীর হিকমত। তার ইয়ট খালি অবস্থায় পড়ে থাকে ফ্রান্সের দক্ষিণ উপকূলে। পরবর্তী কয়েকটা বছর অস্ত্র চোরাচালান ব্যবসাতে ব্যস্ত থাকে সে। দুনিয়ার বিভিন্ন জায়গায় তাকে দেখা গেছে বলে রিপোর্ট পাওয়া গেলেও, নিশ্ছিদ্র কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি। এ-ধরনের রিপোর্ট এসেছে বার্লিন, তেহরান, তেল আবিব, বৈরুত, বেলফাস্ট, জাফনা, প্যারিস ও লন্ডন থেকে।

নতুন তথ্যের সন্ধানে পাতার পর পাতা উল্টে গেল রানা। হার্বার্ট রকসনের যোগান দেয়া সি.আই.এ. রিপোর্টে চোখ বুলাতে গিয়ে চমকে উঠল ও। নিজের চোখকেই যেন বিশ্বাস করতে পারল না। টাইপ করা অনেকগুলো কাগজ, তবে হরফের চেয়ে জোরাল ভাষায় কথা বলছে ছবিগুলো।

এম.ভি.এফ. সত্যবাবা, স্বর্গযাত্রী তথা সত্য সমিতির নেতা, কেউ তার ছবি তুলতে চাইলে কখনও বাদ সাধেনি। আসলে, ছবি তোলানোর ব্যাপারে নির্লজ্জ উৎসাহ রয়েছে তার। এটাই, ধারণা করল রানা, তার পতনের অন্যতম কারণ হয়ে দেখা দিতে পারে। জটিল ও উঁচুদরের টেকনোলজির ওপর নির্ভর করে সি. আই. এ. প্রায় একটা অসাধ্যসাধন করেছে। চুরি করে পীর হিকমতের যে ছবিটা তোলা হয় সেটারই একই আকৃতির নমুনা তৈরি করা হয় এক টুকরো সোনার পাত দিয়ে, পাশে থাকে সত্যবাবার অনেকগুলো নমুনা। নতুন, সফিসটিকেটেড ক্যামেরা ইকুইপমেন্ট

পরীক্ষামূলভাবে ব্যবহার করে তারা, একই সাথে দু'ধরনের ছবির ওপর, তারপর দিনের পর দিন ধরে মাপজোক, হিসেব-নিকেশ, কমপিউটার অ্যানালাইসিস চলতে থাকে। এ-সব পরীক্ষা-নিরীক্ষা থেকে পীর হিকমতের মুখমণ্ডলের হাড়, কাঠামো ইত্যাদির মাপ সম্পর্কে কয়েকটা তথ্য বেরিয়ে আসে।

এমনকি ক্লোজ-আপ ছবিতেও, পীর হিকমতের সাথে সত্যবাবার চেহারায় কোন মিল নেই। সত্যবাবার অবয়ব লম্বাটে, নাকটা ওপরের দিকে প্রায় ওল্টানো, মাথায় চুল খুব কম, তবে কালো ও পরিপাটি করে আঁচড়ানো, কপালের কাছ থেকে ব্যাকব্রাশ করা। অথচ এক্সপার্টরা ছবির পর ছবি সাজিয়ে পরিষ্কার দেখিয়ে দিয়েছে, কিভাবে দু'জনকে একই লোক বলে সহজে প্রমাণ করা যায়, কারণ বেসিক বোন স্ট্রাকচার নিখুঁতভাবে মেলে। কমপিউটর ইমেজ-এর সাহায্যে তারা এমনকি এ-ও দেখিয়েছে, কী চাতুর্যের সাথে পীর হিকমতের মুখের চেহারা বদলে দিয়েছে দক্ষ একজন প্লাস্টিক সার্জেন্ট।

আরও দুটো প্রমাণ এক্সপার্টদের সিদ্ধান্তকে সমর্থন করে। প্রথমটা দুই পাতা জুড়ে রয়েছে—পীর হিকমতের বাম কব্জির বহুগুণ বড় করা ছবি, তার একমাত্র ফটোগ্রাফ থেকে নেয়া; অপর পাতায় সেই একই কব্জির একই আকৃতির ছবি, সত্যবাবার একটা ফটোগ্রাফ থেকে নেয়া। সারা দুনিয়ায়, এক্সপার্টদের একটা বক্তব্য, পীর হিকমতের হাতঘড়ির দ্বিতীয় কোন নমুনা বা ডুপ্লিকেট নেই। অথচ এখানে দেখা যাচ্ছে দুই কব্জিতে পরা দুটো হাতঘড়ি আসলে একই জিনিস। ছ'বছরের ব্যবধানে তোলা হয়েছে ফটো দুটো।

নিশ্ছিদ্র প্রমাণটা রয়েছে অবশ্য অন্য জায়গায়, দুই কানে। সম্ভবত অহমবোধের কারণেই, পীর হিকমত প্লাস্টিক সার্জেনকে তার কান ছুঁতে দেয়নি। দেবেই বা কেন? ৯৯% নিশ্চিত ছিল সে, পীর হিকমতের ফটোগ্রাফ কারও কাছে নেই। পীর হিকমত আর সত্যবাবার কান হুবহু এক–আট পাতা জুড়ে মেডিকেল নোট, ডায়াগ্রাম, ফটোগ্রাফ আর মেজারমেন্ট তাই প্রমাণ করে। নিঃসন্দেহে বলা চলে, এটাই একমাত্র অকাট্য প্রমাণ।

'অহঙ্কারই পতনের মূল,' বিড়বিড় করে আওড়াল রানা, নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করল একই লোকের দিকে তাকিয়ে আছে ও–এই লোকই নাদিরা রহমানের মৃত্যুর জন্যে দায়ী, ডোনা চেস্টারফিল্ডের গলা থেকে বেরিয়ে আসা কর্কশ, রোমহর্ষক কণ্ঠস্বরের অধিকারী।

একমাত্র সৃষ্টিকর্তাই বলতে পারবে, হিকমত ওরফে সত্যবাবা আর কি আতঙ্কের জন্ম দেবে।

ধীরে ধীরে ফাইলটা বন্ধ করে উঠে দাঁড়াল রানা। ওর জন্যে আরও কাজ রয়েছে। অন্তর থেকে বিশ্বাস করল ও, তদন্তের এক পর্যায়ে দ্বৈত ভূমিকায় অবতীর্ণ লোকটার মুখোমুখি হবার সুযোগ হবে ওর।

সাত

'আমেরিকানদের এভিডেন্স বিশ্বাস করেন আপনি, মি. লংফেলো?'

বি.এস.এস. চীফের দিকে এমন দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে রানা, যেন মুখের রেখা আর ভাঁজ দেখে ভদ্রলোকের ভবিষ্যৎ আন্দাজ করতে চাইছে।

'করি। আমার কোন সন্দেহ নেই, পীর হিকমত আর সত্যবাবা একই ব্যক্তি। সেজন্যেই কেসটাকে আর্জেন্ট বলছি আমি।'

রানার চোখে প্রশ্ন।

'হিকমতের বিরুদ্ধে আজ পর্যন্ত কেউ কিছু প্রমাণ করতে পারেনি, অন্তত এমন কোন প্রমাণ নেই যা টিকবে। অথচ আমরা জানি, লোকটা কয়েক হাজার লোকের মৃত্যুর জন্যে দায়ী–তাদের বেশিরভাগই অসহায় ও নিরীহ।' বি. এস. এস. চীফ যুক্তি দেখালেন, তাঁর সাথে একমত হলো রানা। কোথাও যখন কোন সন্ত্রাসী ঘটনা ঘটে–শ্রীলংকার জাফনায় বোমা বিস্ফোরিত হয়, পাকিস্তানে লাইনচ্যুত হয় প্যাসেঞ্জার ট্রেন, প্যারিসের জনাকীর্ণ রাস্তায় এক পশলা গুলি হয় মেশিনগান থেকে, জার্মানীর কোন নাইটক্লাবে গ্রেনেড ফাটে, কিংবা বৈরুতের কোন পুলিস অফিসারকে গুলি করে মারা হয়–খোঁজ নিলে দেখা যাবে, প্রায় প্রতিটি ঘটনার পিছনে হাত ছিল পীর হিকমতের, তারই সরবরাহ করা অস্ত্র বা বোমা ব্যবহার করা হয়েছে। হার্টবিটের সাথে তাল মিলিয়ে ডেস্কের ওপর এক হাত দিয়ে মৃদু চাপড় মারছেন মারভিন লংফেলো। 'কিভাবে সন্ত্রাসের জন্ম দিতে হয়, হিকমতের তা জানা আছে। ধরা না পড়ার কৌশলও তার শেখা আছে। সে হয়তো বিবেককে এই বলে প্রবোধ দেয়, একটা অস্ত্র বা একটা বোমা তার কাছ থেকে নিয়ে কে কিভাবে ব্যবহার করল সেটা তার

দেখার বিষয় নয়, সেজন্যে নিজেকে দায়ী বলে মনে করার কোন কারণ নেই। কিন্তু আমরা জানি, অবশ্যই দায়ী সে।

‘ভোল পাল্টে আবার সত্যবাবা সেজেছে লোকটা! সরল, অজ্ঞ, ধর্মভীরু কিছু মানুষের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে ব্যবসা ফেঁদে বসেছে। এ-ও উগ্র ধর্মীয় মৌলবাদ, রানা। শুরুতেই এর জড় উপড়ে ফেলতে হবে। ধর্মের জিকির তুলে ইউরোপে কেউ অন্যায় স্বার্থ উদ্ধার করবে, এ আমরা মেনে নিতে পারি না।’

‘লোকটা সম্পর্কে ভাল যে-সব কথা শোনা যাচ্ছে, এ-সবের অন্য কোন তাৎপর্য না থেকেই পারে না। বিবাহের পবিত্রতা, দুর্নীতিমুক্ত সমাজ, ব্যভিচারবিরোধী স্লোগান, নেশাখোরদের চিকিৎসা—এ-সব বলে আসল কুমতলবটা আড়াল করার চেষ্টা করছে সে। তোমাকে জানতে হবে, রানা, সেই কুমতলবটা কি। সন্ত্রাস, অস্ত্র আর মেয়েমানুষ ছাড়া আসলে আর কিছু বোঝে না ওই লোক।’

‘নির্দিষ্ট কোন উদ্দেশ্য বা টার্গেট সম্পর্কে এক-আধটা সূত্র পাওয়া গেলে...’

‘কোন সূত্র নেই, রানা।’ মারভিন লংফেলোর চোখেমুখে সহানুভূতির চিহ্নমাত্র দেখা গেল। ‘ওদের উদ্দেশ্য বা টার্গেট তোমাকেই আবিষ্কার করতে হবে।’

‘ক্রেডিট কার্ড অফিস, মি. লংফেলো?’

ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকিয়ে রানার সামনে ডেস্কের ওপর একটা কার্ড রাখলেন বি.এস.এস. চীফ। তাঁর নিজের হাতে লেখা, সবুজ কালিতে, একটা ঠিকানা দেখল রানা। অ্যাভং কার্ট, অক্সফোর্ড স্ট্রীট। টেলিফোন নম্বরও আছে। ‘ব্যাপারটা বেআইনী নয়,’

বললেন তিনি। 'ব্যাংক অভ ইংল্যান্ডের অনুমোদন নেয়া আছে। ওরা কোথাও বিজ্ঞাপন দিচ্ছে না বা কতটুকু কি ব্যবসা করছে তা-ও জানা যাচ্ছে না, তবে অ্যাভং কার্ট যে আইনসম্মতভাবে প্রতিষ্ঠিত একটা ক্রেডিট কোম্পানী তাতে কোন সন্দেহ নেই। দশ মিলিয়ন পাউন্ড স্টার্লিং অ্যাসেট নিয়ে কাজ শুরু করেছে ওরা।'

'এ-সব আপনি, মি. লংফেলো...?'

'পেয়েছি আমাদের ল্যাবরেটরি থেকে,' বললেন মারভিন লংফেলো। 'জেসমিন এখনও কার্ড দুটো নিয়ে কাজ করছে। ওগুলোকে "স্মার্ট কার্ড" বলতে পারো, আমাদের অফিসের নিষিদ্ধ এলাকায় ঢোকার জন্যে এ-ধরনের কার্ড আমরাও ব্যবহার করি। প্লাস্টিকের ভেতর খুদে ইলেকট্রনিক ব্রেন ঢোকানো আছে। ওগুলো খোলার চেষ্টা করা হচ্ছে, আরও সময় নেবে। ভেতরে একটা ফোন নম্বর দেখতে পেয়ে আমাকে জানায় জেসমিন। সূত্রটা ব্যবহার করে ঠিকানা পেয়ে গেছি।'

'আমি কি সরাসরি ওখানে চলে যাব, মি. লংফেলো?' জানতে চাইল রানা। 'গিয়ে বলব, সদস্য হতে চাই?'

ভুরু কুঁচকে রানার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন মারভিন লংফেলো। তারপর হঠাৎ তিনি গাম্ভীর্য ঝেড়ে ফেলে মৃদু হাসলেন, খানিকটা চ্যালেঞ্জের সুরে বললেন, 'কিভাবে কি করবে তুমি তা-ও কি আমাকে বলে দিতে হবে? গত অ্যাসাইনমেন্টের ধকল ইতিমধ্যে নিশ্চয়ই কাটিয়ে উঠেছে জেমস বন্ড, তবু তাকে আমি প্যারিস থেকে ফেরত আনছি না—কারণটা বুঝতে পারছ কি? এরইমধ্যে কেসটার সাথে তুমি জড়িয়ে পড়েছ, সেটাই একমাত্র কারণ নয়। গুরু, ঋষি, সাঁইবাবা, পীর, ভগবান, এদের সম্পর্কে

তুমি ভাল বুঝবে, সেটাও আসল কারণ নয়। আসল কারণ, কেসটাকে আমি সাংঘাতিক জটিল আর বিপজ্জনক বলে ধারণা করছি। আমার আরও ধারণা, তুমি ছাড়া আর কেউ পীর হিকমতকে সামলাতে পারবে না।' মাথা ঝাঁকালেন তিনি। 'সরাসরি যাওয়াই তো ভাল। কিছু না কিছু জানার সুযোগ হবে।'

'সরাসরি ভেতরে ঢুকি, আর গুলি খেয়ে মরি!' ভাবল, কিন্তু বলল না রানা। মুখে বলল, 'ওখানে যদি কোন বিপদ বা ঝামেলা হয়...' শেষ করতে পারল না।

'অকুপেশন্যাল হ্যাজার্ড।' ইঙ্গিতে দরজাটা দেখিয়ে দিলেন মারভিন লংফেলো। মাঝে মধ্যে রানার সাথে এরকম ব্যবহার করেন তিনি, যেন রাহাত খানের ভূমিকা নেয়ার চেষ্টা করেন। 'বেরিয়ে পড়ো, রানা। সাধ্যমত চেষ্টা করো।'

'মি. লংফেলো, বলছিলাম কি...' তাঁর অভিনয়টা টের পেতে অসুবিধে হয় না রানার, সকৌতুকে সহযোগিতা করে ও।

'কোন ব্যাকআপ পাচ্ছ না,' কড়া সুরে বললেন মারভিন লংফেলো, যেন রানা কি বলতে চায় জানেন। 'অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নেবে।'

চল্লিশ মিনিট পর অক্সফোর্ড স্ট্রীটে পৌঁছে গেল রানা। পাশাপাশি অনেকগুলো বিল্ডিং, সেগুলোর সামনে দিয়ে হাঁটছে ও।

একটা ট্যাক্সি নিয়ে ব্রডকাস্টিং হাউস পর্যন্ত এসেছে রানা, তারপর পায়ে হেঁটে অক্সফোর্ড সার্কাস পেরিয়ে এখানে পৌঁচেছে। পুরোপুরি নিশ্চিত, কেউ ওর পিছু নেয়নি। অথচ বিল্ডিংটার সামনে পৌঁছুবার সাথে সাথে ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় সতর্ক করে দিল ওকে, ও একা

নয়।

ঠিকানা মিলেছে, তবে বিল্ডিংটার সামনে থামল না রানা, বা আশপাশে ঘুর ঘুর করল না। মুখ তুলে একবার শুধু তাকিয়ে যেমন হাঁটছিল তেমনি হাঁটতে লাগল। বিল্ডিঙের নিচের অংশটা অর্ধবৃত্তাকার কাঁচ দিয়ে মোড়া, ভেতরে রিসেপশন ডেস্ক, খান কতক চেয়ার আর সোফা দেখা গেল। হাঁটতে হাঁটতে ভাল একটা জায়গার সন্ধানে থাকল ও, যেখান থেকে পিছন ফিরে তাকানো যাবে, আরেকবার দেখে নেয়া সম্ভব হবে বিল্ডিংটা, চোখ বুলানো যাবে সামনে ও আশপাশে। ও জানে, ওর ওপর নজর রাখছে কেউ।

ত্রিশ গজ সামনে পথচারী পারাপার, রাস্তার ওপারে একটা গলি। রানা ধারণা করল, গলির ভেতর দিয়ে এগোলে আবার বিল্ডিংটার সামনের রাস্তায় বেরিয়ে আসা যাবে। সেটাই ভাল, ভাবল ও, ভেতরে ঢোকার আগে আরেকবার চারদিকটা দেখে নেয়া দরকার।

রাস্তা পেরুবার আগে ফুটপাথের কিনারায় থামল রানা, যেন গাড়ি-টাড়ি আসছে কিনা লক্ষ করছে। ওর দৃষ্টি বিল্ডিংটার সামনের রাস্তায় এক সেকেন্ড ঘোরাফেরা করল। বিল্ডিংটার ঠিক উল্টো দিকে, 'নো পার্কিং' লেখা ফুটপাথের ধারে, ছোট একটা ভ্যান পার্ক করা রয়েছে। ড্রাইভারের সীটে কেউ নেই। তবে ভ্যানের ভেতর কি আছে না আছে বলা অসম্ভব। ভ্যান থেকে কোন এরিয়াল বা অ্যান্টেনা বেরিয়ে নেই দেখে খানিকটা স্বস্তি বোধ করল রানা। এরিয়াল অত্যন্ত বিপজ্জনক জিনিস, কারণ ওগুলোয় আড়িপাতা যন্ত্র থেকে শুরু করে আগ্নেয়াস্ত্র, সবই লুকিয়ে

রাখা যায়। এই লন্ডনেই একবার একটা এরিয়ালে ফাইবার অপটিক লেন্স পেয়েছিল রানা, ইন্টারনাল মনিটরে পরিষ্কার ৩৬০দ্ম ছবি পাঠাচ্ছিল।

রাস্তাটার আরও খানিক সামনে একজন লোককেও দেখতে পেল রানা, ব্যস্ত পথিকদের সাথে তার আচরণে কোন মিল নেই। লোকটা ফুটপাথের ওপর অস্থিরভাবে পায়চারি করছে, ঘন ঘন চোখ বুলাচ্ছে হাতঘড়ির ওপর, যেন কারও জন্যে অপেক্ষা করছে। ফুটপাথের কিনারায় আরও গাড়ি পার্ক করা রয়েছে, ফুটপাথে দাঁড়িয়ে রয়েছে একাধিক লোক, তবে রানার চোখে শুধু ভ্যান আর অস্থির লোকটাকেই সন্দেহজনক বলে মনে হলো।

রাস্তা পেরিয়ে গলিটার ভেতর ঢুকল রানা, হতাশ হয়ে লক্ষ করল একটা কানাগলির ভেতর ঢুকেছে সে। উপায় নেই, ভান করতে হবে ঠিকানা খুঁজে পায়নি। জ্যাকেটের পকেট থেকে খালি একটা নোটবুক বের করল, অনুভব করল হোলস্টারে রাখা নাইন এমএম এএসপি অটোমেটিকের স্বস্তিকর কঠিন স্পর্শ।

ধীরে ধীরে আবার মেইন রোডে বেরিয়ে এল রানা, মাঝে-মধ্যে দাঁড়াল, চিন্তিত ভঙ্গিতে পাতা ওল্টাল নোটবুকের। সামনে পেয়ে এক বয়স্কা মহিলাকে দাঁড় করাল ও। ঠিকানা বলে জানতে চাইল, কোন্ দিকে যেতে হবে তাকে। হেসে উঠলেন মহিলা, হাত তুলে দেখিয়ে দিয়ে বললেন, 'তুমি তো, বাবা, ওটার সামনেই পৌঁছে গেছ!'

নোটবুকে আরেকবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে অবিশ্বাসের সাথে কাঁচমোড়া বিল্ডিংটার দিকে এগোল রানা। চোখের কোণে ধরা পড়ল সেই একই জায়গায় পায়চারি করছে লোকটা, ভ্যানটাও

দাঁড়িয়ে আছে আগের মত, ড্রাইভিং সীটটা খালি।

লবিটা দেখতে আধখানা চাঁদের মত, উজ্জ্বল আলোর বন্যা বয়ে যাচ্ছে, ভেতরটা ঠাণ্ডা। লবির দেয়াল ঘেঁষে টব রয়েছে সার সার, পরিবেশটাকে সুন্দর করে তুলতে আধুনিক ফার্নিচারের সাথে পাতাবাহারগুলোরও অবদান আছে। রিসেপশন ডেস্কে এক লোক বসে আছে, মধ্যবয়স্ক, চেয়ারে হেলান দিয়ে পত্রিকা পড়ছে। রানাকে ঢুকতে দেখে শিরদাঁড়া সিধে করল সে, জানতে চাইল, 'বলুন, আমি কোন সাহায্যে আসতে পারি?' মিষ্টি হাসি ফুটল ঠোঁটে।

'অ্যাভং কার্ট।' রানাও নিঃশব্দে হাসল।

'পাঁচতলায়, স্যার,' বলে জোড়া এলিভেটরের দিকে হাত লম্বা করল লোকটা, ডেস্কের ডান দিকে।

মাথা ঝাঁকিয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল রানা, জোড়া এলিভেটরের সামনে দাঁড়িয়ে একটা কল বাটনে চাপ দিল। বোতামের নিচে একটা বোর্ড রয়েছে, তাতে বিভিন্ন কোম্পানী ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের নাম লেখা। মাল্টি ডাটা সার্ভিসেস লিমিটেড দোতলায়, সুইট হোম গৃহায়ন সমিতি তিনতলায়, চারতলায় রয়েছে হ্যাপি ইন্সুরেন্স কোম্পানী। সব মিলিয়ে আটটা ফ্লোর। ছ'তলার পুরোটা দখল করে আছে আইন উপদেষ্টাদের একটা সংস্থা। সাততলায় দুটো ব্যবসা প্রতিষ্ঠান কাজ করছে, দুটোই ইনডেনটিং অফিস। আটতলায় রয়েছে ট্রাক মালিক সমিতি, ঠিকাদার সমিতি আর আমদানীকারক সমিতি। হ্যাঁ, অ্যাভং কার্ট পাঁচতলাতেই। অ্যাভং কার্ট-এর নিচে ছোট ছোট অক্ষরে লেখা রয়েছে, বন্ধনীর ভেতর: অ্যাভং কার্ট সত্য সমিতির চ্যারিটি ট্রাস্ট-

এর একটা অংশবিশেষ। এলিভেটরের দরজা খুলে গেল, ভেতরে ঢুকে পাঁচতলার বোতামে চাপ দিল রানা।

এলিভেটরের ভেতর অদৃশ্য স্পীকার হঠাৎ জ্যান্ত হয়ে উঠল। উৎকর্ণ হলো রানা। ওকে বিস্মিত ও সতর্ক করে দিয়ে একটা গান বাজতে শুরু করল। ম্যাডোনার এই গানটা অত্যন্ত প্রিয় ওর। মানে? ওরা তাহলে জানে, আসছে ও? হেরিফোর্ড থেকে লন্ডনে আসার পথে ঘটনাগুলো মনে পড়ে গেল রানার। মন, মাথা ও পেশী, অত্যন্ত সতর্ক হয়ে উঠল ওর।

থামল এলিভেটর, দরজা খুলে গেল, সেই সাথে বন্ধ হয়ে গেল ম্যাডোনার গান। এলিভেটর থেকে বড়, ঠাণ্ডা, অর্ধচন্দ্র আকৃতির একটা রিসেপশন হলে বেরিয়ে এল ও। এখানে ডেস্কে কোন লোক নেই, ডেস্কের পিছনে গোটা দেয়ালটা অস্বাভাবিক মোটা কাঁচ দিয়ে তৈরি, কাঁচের ভেতর দিয়ে একটা কামরা দেখতে পেল ও, মনে হলো দৃষ্টিসীমা ছাড়িয়ে বিস্তৃত হয়েছে সেটা–জানে, কাঁচ আর আয়নার কারসাজি ছাড়া কিছু নয়। কামরাটাকে দেখে মনে হলো, সতর্কতার সাথে জীবাণুমুক্ত করা হয়েছে।

কামরার ভেতর দীর্ঘ সারিতে কমপিউটর ওঅর্ক স্টেশন দেখল রানা। ওগুলোর পিছনে, ডান ও বাম দিকে, আরও অনেক কাঁচের তৈরি পর্দা দেখা যাচ্ছে, প্রতি চারটে করে কাঁচের পর্দার ভেতর একটা করে কামরা, প্রতিটি কামরায় বিশাল আকৃতির ডাটা ব্যাংক। একটা ওঅর্কস্টেশনেও লোক নেই। বিপুল কাজ করার আয়োজন রয়েছে অ্যাভং কার্ট অফিসে, কম করেও পঁচিশ-ত্রিশজন টেকনিশিয়ান থাকার কথা অথচ একজনকেও দেখা যাচ্ছে না। গেল কোথায় সবাই?

সতর্কতার সাথে ডেস্কের দিকে এগোল রানা, নরম কার্পেটে প্রায় ডুবে গেল জুতো। ডেস্কের সামনে পৌঁছে শব্দ করে কাশল ও। চকচকে ডেস্কে একটা বেল রয়েছে, দেখতে পেয়ে বোতামটায় দু'বার চাপ দিল।

কয়েক সেকেন্ড পর পিছনের লম্বা কামরার দূর প্রান্তে নড়াচড়ার আভাস পাওয়া গেল। তারপর দেখা গেল খালি ডেস্কগুলোকে পাশ কাটিয়ে স্কার্ট পরা দীর্ঘাঙ্গী এক যুবতী এগিয়ে আসছে।

কাঁচের কামরা আর রিসেপশন হলের মাঝখানের দরজায় আসতে প্রায় এক মিনিট লেগে গেল তার। মেয়েটাকে ভাল করে দেখার যথেষ্ট সময় পেল রানা। তাকে দেখে যে-সব প্রশ্ন জাগল মনে, তার প্রায় কোনটিরই সন্তোষজনক উত্তর মিলল না। মেয়েটার হাঁটার ভঙ্গি ও ড্রেস ইউরোপিয়ান বলে মনে হলো, হাইহিলের শ্রুতিমধুর শব্দ তুলে হেঁটে এল সে। মেয়েটা ফর্সা, অতিরিক্ত ফর্সা, সাদা রঙের সাথে লালচে একটা ভাবও আছে, কিন্তু চোখ দুটো কালো। বাঙালী? স্কার্টটা কালো সিল্ক, শার্টটা সাদা সিল্ক। গলার কাছে কালো একটা রিবন জড়ানো রয়েছে। তার হাঁটার মধ্যে দৃঢ় আত্মবিশ্বাসের ভাবটা লক্ষ করার মত। একহারা গড়ন, অত্যন্ত আকর্ষণীয়া, তবে রানার চোখে একটু যেন বড় মনে হলো বুক। মেয়েটাকে প্রচলিত অর্থে ঠিক সুন্দরী বলা যাবে না, তবে চেহারায় কমনীয়তা আছে, সুশ্রী বলতে হবে, চোখ আর মুখের চারপাশে মিষ্টি একটা কৌতুকের ভাব চোখ এড়াবার নয়। স্টাইল বা ফ্যাশনের স্বার্থে ছোট করে ছাঁটা হয়েছে কালো চুল, রানার ঠিক মানানসই লাগল না। মেয়েটা দরজা খুলছে, এক

সেকেন্ডের জন্যে সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগল রানা—চুলগুলো আসল, নাকি রঙ করা হয়েছে? চুলের কালো গভীরতা অবাস্তব বা কৃত্রিম লাগল ওর।

'গুডমর্নিং, স্যার। আমি কোন সাহায্যে আসতে পারি?' ইংরেজিতে বলল মেয়েটা, সাথে সাথে তার আমেরিকান বাচনভঙ্গি ধরতে পারল রানা। মিষ্টি কৌতুকের ভাবটা ঠিক ধরেছে রানা, মুখ নড়ার সাথে সাথে মেয়েটার কোমল ও হাসিখুশি স্বভাবটা যেন বেরিয়ে পড়ল। কাছ থেকে নিশ্চিত হলো ও, মেয়েটার চোখ দুটো সত্যি কালো।

'ভাবছি আপনি কোন সাহায্যে আসতে পারবেন কিনা। আমি আসলে অ্যাভং কার্ড-এর জন্যে আবেদন করতে চাই।'

'ও, আচ্ছা!' ঠোঁট টিপে সামান্য হাসল মেয়েটা। 'সত্যি আমি দুঃখিত, আমি বোধহয় আপনার কোন সাহায্যে লাগব না।'

'তাই?' মেয়েটাকে ছাড়িয়ে রানার দৃষ্টি পিছন দিকে চলে গেল, মোটা কাঁচ ভেদ করে কাজের জায়গায়।

রানার দৃষ্টি অনুসরণ করে পিছন দিকে একবার তাকাল মেয়েটা। 'হ্যাঁ।' আবার ক্ষীণ হাসল সে। 'হ্যাঁ, জানি। কোন স্টাফ নেই। স্টাফ বলতে একা শুধু আমি। আমিও এখন পর্যন্ত তেমন কোন নির্দেশ পাইনি। কার্ড গ্রহণ করার আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে আপনাকে?'

'না। না, কোন আমন্ত্রণ...'

'আসলে, এ-ব্যাপারে আমার যদি কোন ক্ষমতাও থাকত, আপনার আবেদন গ্রহণ করতে পারতাম না আমি। শুধু আমন্ত্রণ পেলে আবেদন করার নিয়ম। আমাকে বলা হয়েছে, যারা সত্য

সমিতির চ্যারিটি ট্রাস্ট-এর সদস্য, শুধু তাদেরকে আমন্ত্রণ জানানো হয়।' রানাকে খুঁটিয়ে লক্ষ করল মেয়েটা। 'আমাদের কার্ডের কথা কোত্থেকে শুনলেন আপনি, স্যার?'

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'আমার পুরানো এক বন্ধুর কাছে আছে।' রানা ভাবল, খবরটা কাগজে ছাপা হয়ে গেছে, ওর কথার কি প্রতিক্রিয়া হবে কে জানে। 'আমার বন্ধুর নাম নাদিরা রহমান। তার কাছে একটা অ্যাভং কার্ট দেখেছি আমি।'

'কিন্তু...' শুরু করল মেয়েটা, সামান্য বড় হলো চোখ দুটো। তারপর কি যেন মনে পড়ে গেল তার। 'ও, আচ্ছা–হতে পারে তিনি হয়তো বিশেষ সুবিধে পেয়েছেন। আমি আপনার ঠিকানা রাখতে পারি? ভবিষ্যতে যদি কখনও সদস্য গ্রহণ করা হয়...'

হাসল রানা, হাসিটা যেন মেয়েটার মুখ লক্ষ্য করে ছুঁড়ে মারা হলো। মেয়েটা লজ্জায় রাঙা ও আড়ষ্ট হয়ে উঠল দেখে খুশি হলো ও। 'মাসুদ,' বলল ও। 'মাসুদ কায়সার।' লন্ডনের একটা ঠিকানা দিল ও, ওখানে খোঁজ নেয়া হলে তথ্যটা নির্ভেজাল বলে প্রমাণিত হবে।

'এটুকুই শুধু পারি আমি, মি. কায়সার...আপনার নাম-ঠিকানা টুকে রাখলাম। আসলে...' ইতস্তত করল মেয়েটা, যেন নিজের উচ্চারিত শব্দের ওজন অনুভব করার চেষ্টা করল, 'আসলে, আপনার মত আমিও অন্ধকারে রয়েছি।' দরজার দিকে এক পা পিছু হটল সে, ভাব দেখে মনে হলো আশা করছে রানাও তাকে অনুসরণ করবে।

করলও রানা তাই।

মেয়েটা কথা বলছে, দু'জনে ওঅর্করুমে ঢুকল। 'সত্যি কথা বলতে কি, অফিসটায় আপনিই প্রথম ঢুকলেন। এখানে আমি চাকরি করছি মাত্র দু'হপ্তা ধরে—এ ক'দিনে যতটুকু বুঝতে পেরেছি, স্টাফ বলতে একা শুধু আমি।

'এখানকার সমস্ত দায়িত্ব তাহলে আপনার ওপর?' রানার প্রশ্নের মধ্যে বিস্ময় ও অবিশ্বাস, দুটোই প্রকাশ পেল।

মাথা ঝাঁকাল মেয়েটা।

'বলেন কি!' চারদিকে চোখ বুলাল রানা। সার সার ওঅর্কস্টেশন, প্রতিটি টেবিলে একাধিক টেলিফোন ও ইন্টারকম, জীবাণুমুক্ত ও ডাস্টপ্রূফ কাঁচের ছোট ছোট ঘরের ভেতর অসংখ্য ডাটাব্যাংক ইত্যাদি দেখে ওর যেন হাঁফ ধরে গেল। 'সত্যি?'

'হ্যাঁ।' আবার মাথা ঝাঁকাল মেয়েটা। 'অদ্ভুত, তাই না? প্রায় বিশ লাখ পাউন্ডের আইবিএম হার্ডওয়্যার রয়েছে এখানে, সব আমার ওপর ছেড়ে দিয়েছে ওরা।'

'ওরা আপনার ইন্টারভিউ নেয়নি?'

'হ্যাঁ, নিয়েছে। তিনজন স্মার্ট তরুণ দু'ঘণ্টা ধরে ইন্টারভিউ নিয়েছে আমার। একজন আমেরিকান, একজন ইরানী, একজন ইংরেজ।

'প্রায় এক মাস আগে। দু'ঘণ্টার ইন্টারভিউয়ের জন্যে সকাল ন'টা থেকে পাঁচটা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয় আমাকে, কারণ অসংখ্য ক্যানডিডেট ছিল। কর্তৃপক্ষ আমাকে চিঠি পাঠিয়ে জানায়, চাকরিটা আমি পেয়েছি, সোমবার থেকে কাজে যোগ দিতে হবে। দু'হপ্তা আগের ঘটনা এটা। বেতন অগ্রিম পাঠিয়ে দেয়া হয়, দু'বার টেলিফোন করে আমাকে বলা হয়েছে আমি যেন তৈরি

থাকি, চাকরিপ্রার্থীদের ইন্টারভিউ নিতে হবে আমাকে, নির্বাচিত করতে হবে যাদের আইবিএম সফটওয়্যার সম্পর্কে ভাল ধারণা আছে, অন্তত এক বছর হাতে-কলমে কাজ করার অভিজ্ঞতা না থাকলেই নয়, ভাল ক্যারেক্টার সার্টিফিকেট থাকতে হবে...ছকটা তো আপনি জানেনেই।'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'আপনার চাকরি হলো...নিশ্চয়ই কোথাও বিজ্ঞাপন দেখে আবেদন করেছিলেন?'

দুটো সাময়িকী আর তিনটে দৈনিক পত্রিকার নাম করল মেয়েটা।

'এখানেই বুঝি আপনার ইন্টারভিউ নেয়া হলো?'

'হ্যাঁ।' মুখ তুলে তাকাল মেয়েটা, তার কালো চোখে একটু যেন উদ্বেগের ছায়া দেখল রানা। যেন রানার ধারণাকে সমর্থন জানাবার জন্যেই বলল সে, 'কি জানেন, গোটা ব্যাপারটা আমার ঠিক ভাল ঠেকছে না। এত আয়োজন, এত খরচ, অথচ এ-সব কোন কাজেই আসছে না। ব্যাপারটা একটু পাগলামি নয়?'

'আপনার নাম কি?' স্বাভাবিক প্রশ্ন, বি.এস.এস. হেডকোয়ার্টারে ফিরে কমপিউটরে খোঁজ নেবে রানা।

'নিনি। আমাকে সবাই নিনি বলে ডাকে।'

কোন কারণ নেই, তবু রানার মনে হলো নামটা আসল না-ও হতে পারে। নিনি, কেমন যেন একটা ভুয়া ভুয়া ভাব আছে। তবে বলা যায় না, আসল নামও আজকাল নকল বলে সন্দেহ হয়। 'শুনুন, নিনি—আমাকে যদি জিজ্ঞেস করেন, আমি বলব, উদ্বিগ্ন হবার যথেষ্ট কারণ আছে। এখানকার পরিবেশ, আয়োজন

ইত্যাদি ঠিক স্বাভাবিক বলা যায় না। আপনি বরং আমার ওপর বিশ্বাস রাখুন, লাভ ছাড়া লোকসান হবে না। আপনার পুরো নামটা কি যেন?'

'তোমাদের দু'জনেরই উদ্বিগ্ন হবার যথেষ্ট কারণ আছে!' দোরগোড়া থেকে ভেসে এল কর্কশ হুমকি।

শব্দের উৎস লক্ষ্য করে ফিরল ওরা। পেশীবহুল এক শ্বেতাঙ্গ, নীল ডোরাকাটা সার্জের স্যুট পরে আছে। তার পিছনে আরও দু'জন লোক রয়েছে, দেখেই বোঝা যায় বডিবিল্ডার। নির্দয়, নীচ, ভিলেনের মত চেহারা।

'মি. রবার্টসন!' নিনির গলা থেকে বিস্ময়সূচক একটা ধ্বনি বেরিয়ে এল।

'আপনি ওকে চেনেন?' বিড়বিড় করে জিজ্ঞেস করল রানা।

'মি. রবার্টসন আমার ইমিডিয়েট বস্। তিনিই আমাকে কাজটা দিয়েছেন।'

পেশীবহুল, সুদর্শন, স্মার্ট রবার্টসনের ঠোঁটে ব্যঙ্গাত্মক, ধারাল হাসি ফুটল। 'মি. রবার্টসন তোমাকে চাকরিটা দিয়েছেন, মিস নিনি। মি. রবার্টসন দেন, এবং মি. রবার্টসন কেড়ে নেন। তোমার সম্পর্কে জানি আমরা। তোমার বন্ধু মি. রানা সম্পর্কেও ভাল ধারণা রাখি।'

'ওঁর নাম কায়সার। মাসুদ কায়সার। উনি তো সে-কথাই বললেন আমাকে।'

'আমি সত্যি কথা বলিনি,' সহজসুরেই বলল রানা। 'মি. রবার্টসনই ঠিক বলেছেন।'

'কিন্তু...!' নার্ভাস হয়ে পড়ল নিনি।

সরাসরি রবার্টসনের দিকে তাকাল রানা। 'মি. রবার্টসন, তুমি কি তোমার সঙ্গীদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেবে? কারা ওরা–মি. চোর আর গুণ্ডা?'

সঙ্গীদের উদ্দেশ্যে সঙ্কেত দিল রবার্টসন, তাকে পাশ কাটিয়ে সামনে এগোল তারা, প্রভুভক্ত কুকুরের মত। রানা লাফ দিয়ে ডান দিকে সরে যাবার আগে তিন পা এগোল তারা, ইতোমধ্যে রানার হাতে বেরিয়ে এসেছে এএসপি অটোমেটিকটা।

রবার্টসনকে নড়তে দেখেনি রানা। লোকটা অসম্ভব ক্ষিপ্র, প্রভুর চেয়ে শিষ্যদের ওপর বেশি নজর দিয়ে ফেলায় নিজেকে তিরস্কার করল ও। এক সেকেন্ড আগে দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে ছিল সে, হাজার ডলার দামের স্যুটে অভিজাত আর মার্জিত লাগছিল, পরমুহূর্তে কার্পেটের ওপর হামাগুড়ি দিতে দেখা গেল তাকে, তার হাতে কুৎসিত কি যেন একটা বেরিয়ে এসেছে। বিস্ফোরণটা হলো অত্যন্ত জোরাল, কমবেশি গোটা দশেক আইবিএম কমপিউটার ওঅর্কস্টেশন পরিণত হলো অকেজো প্লাস্টিক, কাচ আর সিলিকন চিপস-এর স্তূপে।

'হাতের ওটা ফেলে দাও, রানা। তা না হলে ঝাঁঝরা হয়ে যাবে।' কথার ফুলঝুরি নয়, ধোঁয়া সরে যাবার পর রবার্টসনের হাতে খাটো, কুৎসিত দর্শন একটা কমব্যাট শটগান দেখল রানা। কোন্ টাইপের অস্ত্র তা নিয়ে মাথা ঘামাল না, তবে এসপিএএস মডেল ১২-র সাথে মিল লক্ষ্য করল–অত্যন্ত শক্তিশালী অস্ত্র, কারণ জিনিসটা সেমি-অটোমেটিক, ছয় সেকেন্ডের মধ্যে সাতটা বারো বোরের কার্ট্রিজ ফায়ার করতে পারে। অস্ত্রটা কতটুকু কি ক্ষতি করতে পারে আন্দাজ করার দরকার নেই, বিধ্বস্ত আইবিএম

হার্ডওয়্যারগুলোই সাক্ষ্য বহন করছে। অনিচ্ছাসত্ত্বেও হাতের এএসপি ফেলে দিল রানা, হাত দুটো মাথার ওপর তুলল।

ইতোমধ্যে গুণ্ডাদের একজন মেয়েটার ঘাড়ে শক্ত হাত রেখেছে, তাকে সামনে নিয়ে এগিয়ে আসছে রানার দিকে।

'পরিস্থিতি এখন আমাদের অনুকূলে,' সন্তুষ্ট চিত্তে বলল রবার্টসন, রানাকেও একই কায়দায় ধরার জন্যে দ্বিতীয় গুণ্ডাটাকে ইঙ্গিত করল সে।

লোকটা রানার দিকে ফিরল, ভঙ্গিটা আনআর্মড কমব্যাট ইনস্ট্রাকটরের, যেন ডামি নিয়ে মহড়া দিচ্ছে। পরমুহূর্তে দেখা গেল রানার ঘাড়টা একহাতে জড়িয়ে ধরেছে সে, অপর হাতটা ওর মাথার পিছনে। রানা জানে, শুধু একটা চাপ দেয়ার অপেক্ষা, ঘাড়টা মট করে ভেঙে যাবে। লোকটার মুখ থেকে একটা গন্ধ ঢুকল রানার নাকে। কড়া মদ বলে চিনতে পারল ও।

'এখন তাহলে কি হবে?' অনেক কষ্টে কথা বলল রানা, লোকটা ওর কণ্ঠনালীতে চাপ বাড়াচ্ছে।

'বন্ধুদের সাথে দেখা করতে যাব আমরা। যাব অত্যন্ত সাবধানে। চুপচাপ।' এগিয়ে এসে রানা আর নিনির মুখোমুখি হলো রবার্টসন। তার বাম আর ডান দিকে রয়েছে ওরা দু'জন। গুণ্ডারা রয়েছে ওদের দু'জনের পিছনে।

'নিচতলার লবিতে নামব। ওখানে আমাদেরকে হাঁটতে দেখে লোকজন ভাববে পরস্পরের বন্ধু আমরা। কেউ যদি কোনরকম চালাকি করে...,' শটগান ধরা হাতটা তুলে দেখল রবার্টসন, তারপর জ্যাকেটের ভেতর লুকিয়ে ফেলল সেটা। 'আশা করি আমার কথা বুঝতে পেরেছ, তাই না?' প্রথমে রানা, তারপর

নিনির দিকে তাকাল সে।

মাথা ঝাঁকাবার ব্যর্থ চেষ্টা করল রানা। বিড়বিড় করল, 'হ্যাঁ।' একই ধরনের বেসুরো একটা আওয়াজ শুনতে পেল নিনির তরফ থেকে। প্রশ্নটা আবার জাগল ওর মনে, নিনিই কি মেয়েটার আসল নাম? মেয়েটা কি বাঙালী?

সঙ্গীদের উদ্দেশ্যে মাথা ঝাঁকাল রবার্টসন। ঘাড়ের ওপর চাপ কমল, তবে শিকারদের ঠিক পিছনেই থাকল গুণ্ডারা।

'আমার পরামর্শ, তোমরা আগে থাকো, মি. রানা আর মিস নিনি। তোমাদের ঠিক পিছনে থাকব আমি, সঙ্গীরা থাকবে আমার পিছনে। আরেকবার মনে করিয়ে দিচ্ছি, আমার হাতের এই জিনিসটা তোমাদের ছাতু বানিয়ে দিতে পারে—আক্ষরিক অর্থেই। এবার...' শ্বেতাঙ্গ তরুণ তার কথা শেষ করতে পারল না, কারণ বিস্ময়কর একটা ঘটনা ঘটতে শুরু করেছে। অল্প সময়ের ব্যবধানে আজ এই দ্বিতীয়বারের মত নড়াচড়াটা ভালভাবে লক্ষ করেনি রানা, তবে বুঝতে পারল কে নড়ল।

নিনির পিছনে দাঁড়ানো লোকটা আহত পশুর মত গুঙিয়ে উঠল। রানা দেখল, কোমর ভাঁজ করে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়েছে নিনি, গুণ্ডা লোকটা অকস্মাৎ নিনির মাথার ওপর থেকে ডিগবাজি খাওয়ার ভঙ্গিতে নেমে আসছে, সোজা রবার্টসনকে লক্ষ্য করে।

ক্ষিপ্রতার সাথে আরেক পশলা গুলি করল রবার্টসন, তবে গুলি করার সময় তার নিজের লোকই ধাক্কা দিল তাকে। রক্ত আর কাপড় যেন বিস্ফোরিত হলো, ছিটকে পড়ল কামরার ভেতর, তবে ইতোমধ্যে সরে গিয়ে দ্বিতীয় গুণ্ডার পিছনে দাঁড়িয়েছে নিনি।

রানা দেখল লোকটার কব্জি চেপে ধরল নিনি। পরমুহূর্তে দেখা গেল, বিশালদেহী লোকটা চারদিকে বন বন করে চক্কর খাচ্ছে। নিনি যেন বাচ্চা একটা ছেলেকে বৃত্তাকারে ঘোরাচ্ছে। এক সময় কব্জিটা ছেড়ে দিল সে, তীক্ষ্ণ আর্তচিৎকার তুলে আরেক সারি আইবিএম-এর ওপর মাথা দিয়ে পড়ল লোকটা। রোমহর্ষক পতন ও ভাঙচুরের শব্দ হলো, পরমুহূর্তে চোখ-ধাঁধানো বৈদ্যুতিক আগুন আর ফুলকি ছুটল চারদিকে। তবে ইতোমধ্যে নিজের এএসপি অটোমেটিকের দিকে ডাইভ দিয়েছে রানা।

মেঝেতে, কার্পেটের ওপর, নিজের হাতে খুন করা সঙ্গীর সাথে ধস্তাধস্তি করছে রবার্টসন। লাশটা গায়ের ওপর থেকে সরাতে কয়েকবারই ব্যর্থ হলো সে, একটা হাত বাড়িয়েও নাগাল পেল না শটগানের।

'হাল ছেড়ে দাও,' কঠিন সুরে তাকে পরামর্শ দিল রানা, হাতের পিস্তলটা রবার্টসনের দিকে তাক করল। কিন্তু ওর কথায় কান না দিয়ে লাশটা অবশেষে গা থেকে ঝেড়ে ফেলল রবার্টসন, একটা হাত এরইমধ্যে পৌঁছে গেছে শটগানের ওপর।

শটগানটা তুলছে রবার্টসন, এই সময় তার পিছনে যেন বাতাস থেকে তৈরি হলো একটা নারীমূর্তি। নিনির হাত দুটো তলোয়ারের ধারাল ফলার মত কোপ মারল, সরাসরি রবার্টসনের ঘাড়ের পাশে।

গুঙিয়ে উঠে নেতিয়ে পড়ল রবার্টসন, তুলো ভরা পুতুলের মত তার ঘাড় এদিক ওদিক গড়াল।

'এ-সব কেরামতি তুমি শিখলে কোত্থেকে?' একই পেশায় আছে ধরে নিয়ে মেয়েটার সাথে ঘনিষ্ঠতা অনুভব করল রানা,

সম্বোধনে নতুন আন্তরিকতা ফুটল। ওর চেহারায় প্রশংসার ভাবটুকুও চাপা থাকল না।

'নিনি খন্দকারকে চিনতে ভুল করেছে ওরা,' বলল মেয়েটা। 'কোত্থেকে শিখেছি? হতে পারে তুমি যেখান থেকে শিখেছ, আমিও সে ধরনের কোথাও থেকে শিখেছি। তবে তোমার চেয়ে ভাল পজিশনে ছিলাম আমি।' হাত দিয়ে শার্ট আর স্কার্ট ঠিকঠাক করল সে, মোজার কিনারা ও বুনন পরীক্ষা করল।

'নিনি খন্দকার, কেমন?' বাংলায় জিজ্ঞেস করল রানা। 'তুমি তাহলে...'

'আমেরিকান/বাঙালী,' নির্লিপ্তকণ্ঠে বলল নিনি। 'বাংলাদেশে জন্ম, আমেরিকান নাগরিক।'

'নিনি, এখান থেকে আমাদের কেটে পড়া উচিত। তবে, তার আগে, আমাকে একটা টেলিফোন করতে হবে।'

নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকাল নিনি। চারদিকে চোখ বুলিয়ে ক্ষতির পরিমাণ আন্দাজ করার চেষ্টা করল। বৈদ্যুতিক আগুনের নীল একটা শিখা কার্পেটের নাগাল পেয়ে গেছে। 'সর্বনাশ!' বলল সে। 'ব্যাখ্যা করতে হলে জান বেরিয়ে যাবে। তোমার নাম কি সত্যি রানা? তুমিও কি বাঙালী?'

'হ্যাঁ,' নিশ্চয়তা দিয়ে বলল রানা। 'মাসুদ রানা। তোমারটা?'

'তোমাকে আমি প্রথমবারই সত্যি কথা বলেছি, তবে তাতে কোন লাভ হলো না আমার। তোমার সম্পর্কে আমার ধারণা যদি সত্যি হয়, তাহলে কোন সন্দেহ নেই তোমার বস্ আমার ওপর ভীষণ খেপে যাবেন।'

'তারচেয়ে বেশি খেপবে রবার্টসনের বস্।'

একমত হলো নিনি, তার দিকে পিছন ফিরে কাছের ফোনটা তুলে নিল রানা। মারভিন লংফেলোকে দু'এক কথায় রিপোর্ট করবে ও, ডিজপোজাল ইউনিটকে জঞ্জাল পরিষ্কার করার জন্যে আসতে বলবে। কিন্তু ফোনটা কোন শব্দ করছে না। রানা আশঙ্কা করল, গোটা বিল্ডিঙের ইলেকট্রিসিটিই বোধহয় অচল হয়ে গেছে। 'আমাদের আর দেরি করা উচিত নয়,' বলল ও, দেখল খপ্ করে হ্যান্ডব্যাগ আর জ্যাকেটটা তুলে নিল নিনি।

'ঠিক।'

দোরগোড়ায় থামল ওরা, পিছন ফিরে তাকাল রানা। 'সত্যি দুঃখজনক,' বলল ও। 'এখানে আমরা একগাদা ইনকমপ্যাটিবল হার্ডওয়্যার রেখে যাচ্ছি।'

এলিভেটরে চড়ল ওরা, বাহনটা এখনও সচল আছে দেখে বিস্মিত হলো।

'রবার্টসন লোকটাকে কখনোই পছন্দ করতে পারিনি আমি,' নিচের তলার রিসেপশন হলে নেমে বলল নিনি, দু'জনের হাবভাব দেখে মনে হতে পারে লাঞ্চ খেতে বাইরে যাচ্ছে।

'তার সঙ্গী দু'জনও পছন্দ হবার মত লোক নয়।' মৃদু হাসল রানা। 'তোমাকে একটা ধন্যবাদ দেয়ার কথা মনে করিয়ে দিয়ো আমাকে, মিস খন্দকার।'

'ভেবো না দেব না।' নিনিও ফিরিয়ে দিল নিঃশব্দ হাসিটা।

বিল্ডিঙটা থেকে বেরিয়ে এসেছে ওরা, এই সময় ফায়ার অ্যালার্মে ট্রিগার অন করে দিল স্মোক ডিটেকটর। ভ্যানটা সেই আগের জায়গাতেই দাঁড়িয়ে আছে, তবে পায়চারি বাদ দিয়ে কোথায় যেন সরে গেছে ফুটপাথের লোকটা। ফুটপাথ ধরে বাম

দিকে হন হন করে হাঁটল রানা, নিনির একটা কনুই ধরে আছে। প্রথম বাঁকটা ঘুরল ওরা, একটা ট্যাক্সির খোঁজে চারদিকে তাকাল। নিনির কনুইটা আরও শক্ত করে চেপে ধরল ও। মেয়েটাকে হাতছাড়া করার কথা ভাবতে পারছে না।

একটা ট্যাক্সি ছুটে আসছে দেখে নিনি জানতে চাইল, 'রানা, তোমার পেশা সম্পর্কে আমাকে বলবে?'

'সিভিল সার্ভেন্ট বলতে পারো।' ট্যাক্সিতে ওঠার পর ড্রাইভারকে রানা বলল, 'কিলবার্ন।'

'সশস্ত্র একজন সিভিল সার্ভেন্ট?'

'ঠিক ধরেছ।'

'সিকিউরিটি সার্ভিস?'

'কিছু যদি মনে না করো, নিনি, আমারও কিছু প্রশ্ন আছে। সত্যি কথা শুনতে চাই আমি। তোমার পেশাটা কি?'

'বেশ।' একটা দীর্ঘশ্বাস চাপল নিনি। 'সত্যি কথাটা হলো, আমি ইউনাইটেড স্টেটস অভ আমেরিকার ইন্টারন্যাল রেভিনিউ সার্ভিসের একজন আন্ডারকাভার ইনভেস্টিগেটর।'

'কেউ ট্যাক্স ফাঁকি দিলে তাকে ধরা তোমার কাজ? কিন্তু ইংল্যান্ডে কি করছ তুমি?'

সরাসরি জবাব না দিয়ে নিনি বলল, 'ছোট্ট একটা সমস্যায় পড়েছি আমি, রানা।'

'বলো?'

'ইংল্যান্ডে আমি কাজ করছি গোপনে, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে অনুমতি চাওয়া হয়নি। তুমি আসলে আমাকে হাতেনাতে ধরে ফেলেছ, রানা।'

'ধরা যখন পড়েই গেছ, তার মাসুল তোমাকে দিতে হবে,' সহাস্যে বলল রানা। 'তবে যোগ-বিয়োগ করে দেখতে হবে, পাপের চেয়ে পুণ্য বেশি করে ফেলেছ কিনা।'

'পুণ্য, রানা?'

'আমার চেয়ে ভাল পজিশনে ছিলে তুমি,' বলল রানা। 'ইচ্ছে করলে ওদের মত আমাকেও কাবু করতে পারতে। কিন্তু তা না করে আমাকে তুমি ওদের হাত থেকে রক্ষা করেছ।'

'তোমার মত উদার মানুষের হাতে ধরা পড়েছি, ভাবতে আমার ভালই লাগছে,' কৃতজ্ঞতার সাথে বলল নিনি।

'অপেক্ষা করো, আমার সবগুলো গুণ সম্পর্কে এখনও কিছু জানো না তুমি।'

আট

'রকসনকে আমি জ্যান্ত কবর দেব!' ডেস্কের ওপর ঘুসি মারলেন মারভিন লংফেলো, ফলে প্রধানমন্ত্রী মার্গারেট থ্যাচার থেকে শুরু করে রাহাত খান পর্যন্ত সবাই থরথর করে কেঁপে উঠলেন তাঁর অফিস কামরার দেয়ালে।

'মি. লংফেলো, আমার কিন্তু মনে হয় না হার্বার্ট রকসন এ-ব্যাপারে কিছু জানে।'

'আমেরিকানরা কি করছে না করছে, সি.আই.এ. তা জানে না, এ হতে পারে? ইংল্যান্ডের মাটিতে বিনা অনুমতিতে তৎপরতা

চালাবে ওরা, আর আমি তা সহ্য করব?' ছোঁ দিয়ে ইন্টারকম ফোনের রিসিভার তুলে নিলেন বি.এস.এস. চীফ, অক্লান্ত ও নিবেদিত প্রাণ এলিজাবেথকে একের পর এক নির্দেশ দিয়ে গেলেন। 'প্রথমে, ইউ. এস. অ্যামব্যাসীর ইনফরমেশন সেক্রেটারি মি. হার্বার্ট রকসনকে আমার অভিনন্দন জানাবে। আজ বিকেল পাঁচটার সময় আমার অফিসে তার জন্যে আমি অপেক্ষা করব। তারপর...'

লিজাকে নির্দেশ দিচ্ছেন মারভিন লংফেলো, আজ সকালের ঘটনায় ফিরে গেল রানার মন। অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নিতে বলেছিলেন বি.এস.এস. চীফ, ঠিক তাই করেছে ও। পরিস্থিতির কারণে অনেক সময় প্রথমে অ্যাকশন নিতে হয়, অনুমতি চাইতে হয় পরে। নিনি খন্দকারকে অক্সফোর্ড স্ট্রীট থেকে সরাসরি বি.এস.এস. সেফ হাউস কিলবার্নে নিয়ে যায় রানা। সাধারণত বি.এস.এস. এজেন্টদের ডিব্রিফিঙের জন্যে এবং অপারেশন শেষ করার পর গা ঢাকা দেয়ার জন্যে ব্যবহার করা হয় সেফ হাউসটা।

কিলবার্ন সেফ হাউসে পৌঁছে জায়গাটা খালি দেখল রানা, তবে সশস্ত্র দু'জন কেয়ারটেকার রয়েছে। ভেতরে ঢুকে প্রথমেই বি.এস.এস. 'ডিপোজাল ইউনিট'-কে টেলিফোন করল ও, অ্যাভং কার্ট অফিসে কি ঘটেছে সংক্ষেপে জানিয়ে নির্দেশ দিল, হতাহতদের যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সরিয়ে আনতে হবে। আগুনের কথা বলে সতর্ক করে দিতে ভুলল না যে ওখানে এরইমধ্যে দমকল বাহিনীর কর্মী ও পুলিস পৌঁছে যেতে পারে। রিসিভার নামিয়ে রেখে সশস্ত্র কেয়ারটেকারদের ডাকল ও, নিনি খন্দকারের

ব্যাপারে কি করতে হবে জানিয়ে দিল। 'মুহূর্তের জন্যেও চোখের আড়াল করবে না। ফিরে গিয়ে যত তাড়াতাড়ি পারি একজন মহিলা অফিসারকে পাঠিয়ে দেব আমি। তার আগে পর্যন্ত ওর সাথে এমন ব্যবহার করবে, ও যেন একটা বাঘিনী–ভয়ও করবে, সমীহও করবে।'

'ইয়েস, স্যার!' কেয়ারটেকার তরুণদের একজন বলল, 'আমাদের দেখতে হবে ওঁর যেন কোন বিপদ না হয়, আর উনি যেন আমাদের জন্যে কোন বিপদ হয়ে না ওঠেন, এই তো?' তার মুখে হাসি নেই।

নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকাল রানা।

পাশের কামরায় ফিরে এসে নিনিকে বলল ও, 'শান্ত হয়ে বিশ্রাম নাও। কেউ যেন বাইরে থেকে তোমাকে দেখতে না পায়। কর্তৃপক্ষের সাথে কথা বলে সব ঠিক করে ফেলব আমি। কোন চিন্তা কোরো না।'

'তোমার পক্ষে বলা সহজ।' ম্লান হাসল নিনি খন্দকার। 'কিন্তু এ তো আর মিথ্যে নয় যে এ-দেশে বেআইনী তৎপরতায় লিপ্ত হয়েছি আমি!'

মিথ্যে নয়, ভাবল রানা। তবে, নিজের ওপর বিশ্বাস আছে ওর, যুক্তি দিয়ে মি. লংফেলোকে বোঝাতে পারবে। ট্যাক্সি করে আসার পথে নিজেদের মধ্যে খানিকটা আলাপ হয়েছে ওদের। রানা নিজেদের পরিচয় পত্র দেখাবার পর নিনিও তার কাগজ-পত্র দেখিয়েছে। নিজের অ্যাসাইনমেন্ট সম্পর্কে পরিষ্কার একটা ধারণা দিয়েছে মেয়েটা। 'সত্যদর্শীদের চ্যারিটি ট্রাস্ট আসলে একটা ফ্রন্ট। ওদের লীডার সত্যবাবা কোটি কোটি ডলার সরিয়ে

ফেলেছে। সত্য সমিতির হেডকোয়ার্টার হলো আমেরিকায়। সারা দুনিয়ায় এ-ধরনের অনেক সমিতি আর ভুয়া কোম্পানী খুলেছে সে। আমাকে নিয়ে ছ'জন এজেন্টকে বিভিন্ন দেশে পাঠানো হয়েছে তদন্ত করার জন্যে। শুধু আমেরিকা থেকেই সত্য সমিতির নামে চাঁদা তোলা হয়েছে কয়েক বিলিয়ন ডলার। ইন্টারন্যাল রেভিনিউ সার্ভিস একা নয়, আরও অনেক এজেন্সি সত্যবাবার বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু করেছে।'

'আচ্ছা!'

অন্য প্রসঙ্গে চলে গেল নিনি খন্দকার, 'এ-কথা বিশ্বাস্য নয় যে তুমি স্রেফ কৌতূহলবশত অ্যাভং কার্ট-এর জন্যে আবেদন করতে গিয়েছিলে। নাদিরা রহমানের নাম বলেছ তুমি। শোনো তাহলে, তার কার্ড আজ সকালে বাতিল ঘোষণা করা হয়েছে। যে অল্প দু'একটা কাজ আমি করেছি, তার মধ্যে ওটা একটা ছিল।'

'নাদিরা রহমান বেঁচে নেই,' শান্ত সুরে বলল রানা। 'সে মারা যাওয়াতেই অ্যাভং কার্ট সম্পর্কে প্রথমে জানতে পারি আমরা। হ্যাঁ, সত্যবাবা যে বহুরূপী, সেটা আমাদেরও ধারণা। অ্যাসাইনমেন্টটায় কতদিন হলো কাজ করছ তুমি?'

'এ-পর্যন্ত পৌঁছুতে দু'মাসের মত খাটতে হয়েছে আমাকে। তারপর কি হলো? মুহূর্তের মধ্যে গোটা ব্যাপারটা কেঁচে গেল।'

'পুরোপুরি কেঁচে গেল, তা বলা যায় না। এইমাত্র মাঠে নেমেছি আমরা, তদন্ত চলতে থাকবে। তোমাকে যাতে কোন আইনের প্যাঁচে পড়তে না হয়, তার জন্যে যথাসাধ্য করব আমি।' মিষ্টি করে হাসল রানা। 'আমাদের ডিরেক্টর, ভাব দেখান বেরসিক, কিন্তু আসলে সুন্দর চেহারার কদর দিতে জানেন—আর

যদি ফিগারটা সুন্দর হয়, ছোটখাট অপরাধ বা ত্রুটি মাফ করে দিতে উৎসাহী হয়ে ওঠেন। ব্যাপারটা তুমি আমার ওপর ছেড়ে দাও।'

অনিশ্চিত দেখাল নিনিকে, তারপর সামনের দিকে একটু ঝুঁকল, আরও যেন কি বলতে চায় সে।

'তোমাকে আমাদের একটা সেফ হাউসে নিয়ে যাচ্ছি,' নিনির কাঁধে হালকা একটা হাত রেখে অভয় দিল রানা। 'অফিসকে সবকিছু ব্যাখ্যা করতে হবে, ততক্ষণ ওখানে থাকতে হবে তোমাকে। তোমার যদি আরও কিছু বলার থাকে, যদি কোন তথ্য দিতে চাও, এখনই বলে ফেলা ভাল। সত্যবাবার ওপর মোটাসোটা একটা ফাইল আছে আমাদের কাছে।'

'হুঁ।' এখনও সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছে নিনি। তারপর রানার দিকে তাকাল সে। 'আরেকটা কথা বলা দরকার। তুমি কি পীর হিকমত বলে কারও কথা শুনেছ কখনও, রানা?'

'আমাদের এই পেশায় শোনেনি কে?'

'একটা লিঙ্ক আছে...এই সত্যবাবা আর হিকমতের মধ্যে।'

'সত্যি? কি ধরনের লিঙ্ক?'

'চিঠি। টেলিগ্রাম। টেলিফোনের একাধিক আলাপ, অন্য এক এজেন্সি মনিটর করে। পীর হিকমত একজন ক্রিমিনাল, যদিও কেউ তার বিরুদ্ধে আজ পর্যন্ত কোন প্রমাণ সংগ্রহ করতে পারেনি। সমস্ত বিবরণ আমার জানা নেই।'

'বলে ভাল করেছ।' কোন তথ্য ফাঁস করতে রাজি নয় রানা। 'আমরাও পীর হিকমতকে ধরতে চাই।'

'তুমি জানো উনিশশো বিশ সালে আল কাপুকে ধরার জন্যে

ইন্টারন্যাল রেভিনিউ সার্ভিসকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল? অনেকদিন পর আবার সে-ধরনের একটা দায়িত্ব চেপেছে আমাদের ঘাড়ে, এম.ভি.এফ. সত্যবাবা আর পীর হিকমতকে ধরতে হবে। তুমি জানো, ওকে কিং অভ টেরর বলা হয়?'

'জানতাম না, তবে নামটা যথার্থ।'

রানার মত নিনিও যদি তথ্য চেপে রাখে তাহলে আলাদা কথা, তা না হলে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে পীর হিকমত আর সত্যবাবা যে একই ব্যক্তি এ-ব্যাপারে তার বস্ তাকে কোন আভাস দেননি। 'তোমার কাজে কোন সমস্যা হলে আমরা সেদিকটা দেখব,' প্রতিশ্রুতি দিল রানা, নিনির হাতের উল্টো পিঠে হালকাভাবে ঠোঁট বুলাল, অপর হাতটা মুঠোর ভেতর নিয়ে চাপ দিল মৃদু।

ইংল্যান্ডে নিনি খন্দকারের উপস্থিতি সম্পর্কে রানার কাছ থেকেই খবর পেলেন মারভিন লংফেলো। সঙ্গত কারণেই হার্বার্ট রকসনের ওপর রাগ হয়েছে তাঁর। কোন মার্কিন এজেন্সি ইংল্যান্ডে আসতে চাইলে স্বরাষ্ট্র অথবা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে আগে থেকে জানিয়ে অনুমতি নিতে হবে, অনুমতি নেয়ার দায়িত্ব ইউ. এস. অ্যামব্যাসীর। ইচ্ছে করলে সরাসরি বি. এস. এস. চীফের কাছ থেকেও অনুমতি চাইতে পারে তারা। দায়িত্ব পালনে তাদের এই ব্যর্থতাকে ছোট করে দেখতে রাজি নন মারভিন লংফেলো। দেশের সার্বভৌমত্বের ওপর শ্রদ্ধা প্রকাশে অবহেলা করা হলে, সে যে-ই হোক, তাকে তিনি ক্ষমা করবেন না।

'সত্যবাবার বিরুদ্ধে কাজ করছে মেয়েটা, মি. লংফেলো। শুধু সত্যবাবা নয়, পীর হিকমতও তার টার্গেট। তাছাড়া, মেয়েটা

অত্যন্ত দক্ষ–ধরতে গেলে আমার প্রাণ বাঁচিয়েছে।' রানার গলায় আবেদন। তখনই ফেটে পড়লেন বি.এস.এস. চীফ, নির্দেশ দিতে শুরু করলেন ইন্টারকমে।

ম্লান চেহারা নিয়ে অপেক্ষা করছে রানা, ইন্টারকমে একের পর এক নির্দেশ দিয়ে যাচ্ছেন মারভিন লংফেলো। একটানা অনেকক্ষণ ডিকটেশন দিলেন তিনি, মার্কিন দূতাবাসে পাঠাতে হবে মেমোটা। একটা করে চিঠি পাঠাতে হবে স্বরাষ্ট্র ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে। এরপর, 'মোস্ট আর্জেন্ট' 'সিক্রেট' একটা নোট ডিকটেট করলেন তিনি, স্পেশাল ব্রাঞ্চ, অ্যান্টি-কোরাপশন, আর মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স অফিসে পাঠানো হবে। এই সময় চেম্বারের দ্বিতীয় দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকল জন মিচেল। বি.এস.এস-এর অপারেশন্যাল হেড সে, মারভিন লংফেলোর চীফ অভ স্টাফ-এর দায়িত্বও পালন করতে হয় তাকে।

বন্ধুকে দেখে স্মিত হাসি ফুটল রানার ঠোঁটে। পরমুহূর্তে ভুরু জোড়া কুঁচকে প্রশ্নবোধক হয়ে উঠল। জন মিচেলের হাতে একটা টেলিগ্রাম দেখতে পাচ্ছে ও। উদ্বেগে থমথম করছে তার চেহারা।

রানার পাশে চলে এল মিচেল, টেলিগ্রামটা ওর চোখের সামনে মেলে ধরল।

'কাল রাতে প্যাঙবোর্নের জমিদার বাড়ি
ছেড়ে চলে গেছে সত্যবাবার শিষ্যরা।
চারপাশে গিজগিজ করছে রিপোর্টাররা। জমিদার বাড়ির
গেটে একটা নোটিস টাঙানো রয়েছে, তাতে লেখা:
সত্যবাবার গোটা সমিতি গোপন আস্তানায় উঠে যাচ্ছে।

কারণ পত্রিকায় তাদের সম্পর্কে আজেবাজে খবর ছাপা হবার পর লোকজন মারমুখো হয়ে উঠেছে। নতুন নির্দেশের জন্যে অপেক্ষা করছি আমি। বার্ড।'

'বার্ড আবার কে?' ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল রানা, মারভিন লংফেলো এখনও নির্দেশ দিতে ব্যস্ত।

'তোমার ট্রেনিং গ্রাউন্ডের সার্জেন্ট–বিল রেম্যান।'

'আমার সার্জেন্ট হতে যাবে কেন?' চাপাকণ্ঠে উষ্মা প্রকাশ করল রানা। 'হেরিফোর্ড থেকে আসার সময় গাড়িটা তাকে চালাতে দিই আমি, ব্যস, তার সাথে এটুকুই সম্পর্ক আমার। আসার পথে সামান্য সমস্যা হয়েছিল, নিজের দক্ষতা প্রমাণ করেছিল লোকটা।'

'বসকে কথাটা বলে দেখো,' ফিসফিস করল জন মিচেলও। 'অস্থায়ীভাবে হলেও, সার্জেন্টকে বি.এস.এস-এর একটা শক্তি বলে গণ্য করা হচ্ছে, তোমাকে ধরা হয়েছে তার সাহায্যকারী বা সহকারী হিসেবে।'

'মারব শালা...,' নিজেকে সামলে নিল রানা।

ঠিক সেই মুহূর্তে রিসিভার নামিয়ে রাখলেন মারভিন লংফেলো, ওদের দিকে ফিরলেন, কটমট করে তাকালেন দু'জনের দিকে। 'কি ব্যাপার, ফিসফাস করার কি ঘটল?'

'বার্ড সঙ্কেত পাঠিয়েছে, স্যার।' কাগজটা বাড়িয়ে ধরল জন মিচেল।

টেলিগ্রামটা পড়লেন মারভিন লংফেলো। 'হুম। চিড়িয়া ভেগেছে, কেমন?'

'সেরকমই মনে হচ্ছে।' নিনি খন্দকারকে বি. এস. এস.

হেডকোয়ার্টারে নিয়ে আসার জন্যে মনে মনে অস্থির হয়ে আছে রানা। সরাসরি কথা বলার সুযোগ পেলে নিজের যোগ্যতা ও প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবে সে, মারভিন লংফেলো তার যুক্তি মেনে নিতে বাধ্য হবেন—অন্তত ওর তাই ধারণা। এক সেকেন্ড ইতস্তত করে প্রশ্নটা করেই ফেলল—'আমি কি, মি. লংফেলো, নিনি খন্দকারকে নিয়ে আসতে পারি?'

সরাসরি রানার দিকে তাকালেন মারভিন লংফেলো। 'কেন?'

'সত্যদর্শীদের দু'একজনের সাথে যোগাযোগ হয়েছে মেয়েটার—তাদের মধ্যে রবার্টসন একজন, আরও দু'জনের নাম আমার জানা হয়নি। নিনির সাথে আমাদের কথা বলা দরকার।'

'সময় হোক। এখন আমি চাই, দেরি না করে ক্লিনিকে চলে যাও তুমি। ডোনা চেস্টারফিল্ডকে নিয়ে প্রফেসর ওয়েদারবাই কি করছেন দেখে এসো।' ক্ষীণ, দুষ্ট হাসি ফুটল মারভিন লংফেলোর ঠোঁটে। 'তার বাপ আজকের দিনটা অন্তত অডিটের ঝামেলা থেকে রেহাই দিয়েছেন আমাদের।'

'বার্ড সম্পর্কে কি ভাবছেন আপনি?' জানতে চাইল রানা।

'কি ভাবব তার সম্পর্কে?' পাল্টা প্রশ্ন করলেন মারভিন লংফেলো।

'প্যাঙবোর্নে তো সত্যদর্শীরা নেই। এখন তাকে কোথায় পাঠানো হবে?'

'এখনও কিছু ঠিক করিনি।'

'কানে এল,' বলল রানা, 'আমাকে তার স্পনসর বলে মনে করা হচ্ছে—তাই ভাবলাম, হয়তো আমাকেই ঠিক করতে হবে তার ভবিষ্যৎ।'

ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকালেন বি. এস. এস. চীফ। 'ভাবছি, তাকে সিঁধ কাটতে পাঠালে কেমন হয়?'

'জ্বী?' বিস্মিত হবার ভান করল রানা। 'সিঁধ কাটতে পাঠাবেন? কিন্তু এর আগে এ-ধরনের কাজ করতে গিয়ে ঝামেলায় পড়তে হয়েছে আমাদের, মি. লংফেলো।'

হেসে উঠলেন মারভিন লংফেলো। 'এর আগে আমরা সিঁধ কাটতে পাঠিয়েছিলাম তোমার ভক্ত সেই ভদ্রলোককে... কি যেন বেশ নাম তার... গিলটি মিয়া! তিনি তখন লন্ডনে ছিলেন। তাকে তুমি বি. এস. এস. এজেন্ট বলো? বাইরের কোন লোক যেখানে খুশি সিঁধ কাটুক, আড়ি পাতুক–কেউ যদি না আবিষ্কার করে যে কাজগুলোয় আমাদের অনুমতি ছিল, আমি খুশিই হব। তবে, বার্ড তার কাজের অনুমতি পাবে–ওপরমহল থেকে।'

সারের পুটেনহাম গ্রামে পৌঁছুতে নব্বুই মিনিট লেগে গেল রানার।

আরও তিন মাইল গাড়ি চালাবার পর সাদা, তিনতলা একটা বাড়ির সামনে থামল ও। আশপাশে আর কোন দালান-কোঠা নেই। বাড়ির চারপাশে ঝোপ-জঙ্গল, খানা-খন্দ, ডোবা আর প্রাচীন বাড়ি-ঘরের ধ্বংসাবশেষ। এদিকে লোকজন বড় একটা আসে না–একটা কারণ লোকবসতি এখান থেকে বেশ অনেকটা দূরে, আরেকটা কারণ কাউকে আসতে দেখলে পথেই বাধা দেয়া হয়।

উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা বাড়িটা। গেটে হোঁৎকা চেহারার

লোকজন পাহারা দেয়। ক্লিনিকের পিয়ন, নার্স, মেসেঞ্জার, ডাক্তার, দারোয়ান, প্রায় সবাই প্রাক্তন সামরিক বাহিনীর লোক।

রানার জন্যে অপেক্ষা করছিল ওরা। দারোয়ানকে পরিচয়-পত্র দেখাতে হলো। ভেতরটা আদর্শ প্রাইভেট হসপিটালের মত ঝকঝক তকতক করছে। বয়স্কা এক নার্স ওয়েটিংরূম থেকে সিঁড়ির দিকে যেতে পথ দেখাল ওকে। 'প্রফেসর এই মুহূর্তে রোগিণীর সাথে রয়েছেন, মি. রানা।' ক্লিনিকে বাইরের কোন লোক আসায় অসন্তুষ্ট বলে মনে হলো তাকে। 'আশা করি তাঁর সাথে বা রোগিণীর সাথে দেখা করার অনুমতি নিয়ে এসেছেন আপনি?'

মাথা ঝাঁকাল রানা। তিনতলায় উঠে এল ওরা। একটা ছোট কামরায় ঢোকার পর নার্স বলল, 'এখানে অপেক্ষা করুন।' চারপাশে তাকিয়ে খান কতক চেয়ার, একটা টেবিল আর টেবিলের ওপর কিছু পত্র-পত্রিকা দেখতে পেল রানা। কামরা থেকে বেরিয়ে গেল নার্স, বলে গেল, 'প্রফেসরকে জানাচ্ছি আপনি এসেছেন।' ভাবটা যেন, রানার মস্ত উপকার করছে সে।

পাঁচ মিনিট পর কামরায় ঢুকলেন প্রফেসর ওয়েদারবাই। শান্ত ভদ্রলোকের চোখ দুটো যেন কৌতুকে নাচানাচি করছে। 'রানা!' উষ্ণ করমর্দনের জন্যে হাতটা বাড়িয়ে দিলেন তিনি। 'কতদিন পর আবার তোমার সাথে দেখা হলো, ভারি খুশি লাগছে। তুমি ভাল তো?' সেই পুরানো, পরিচিত উজ্জ্বল চোখ দুটো কি যেন খুঁজল রানার মুখে, যেন শুধু দৃষ্টি বুলিয়েই রানার স্নায়বিক বা মানসিক সমস্যা টের পেয়ে যাবেন।

মুহূর্তের জন্যে অস্বস্তিবোধ করল রানা। ওর গোপন জীবন

সম্পর্কে সম্ভবত প্রফেসর ওয়েদারবাইই সবচেয়ে বেশি জানেন–পেশাগত গোপন কথা নয়, ওর ব্যক্তিগত ভয়, জটিল কল্পনাবিলাস ইত্যাদি–যা কিনা ওকে প্রেরণা যোগায়, সুখী থাকতে সাহায্য করে। 'কেমন আছে সে?' জিজ্ঞেস করল ও, দ্রুত কাটিয়ে উঠল অস্বস্তিবোধ।

'বেঁচে আছে,' বললেন প্রফেসর, তাঁর কথার সুর শুনে মনে হলো ডোনা চেস্টারফিল্ড সম্পর্কে ওটাই যেন আসল বা শেষ কথা।

'শুধু বেঁচে আছে?'

'না, আমার ধারণা আবার স্বাভাবিক দুনিয়ায় ফিরে আসবে, তবে সেজন্যে সময় লাগবে। চিকিৎসা দরকার তার, দরকার বিশ্রাম আর প্রচুর স্নেহ-ভালবাসা।'

'এখনও তাহলে কিছু বলেনি সে?'

'ওকে আমরা সুস্থতার একটা পর্যায়ে তুলে এনেছি। কেউ একজন–সে নিজে নয়–সত্যি বিরাট একটা ঝুঁকি নিয়েছিল। এমন একটা ককটেল দেয়া হয় তাকে, প্রায় মারা যাচ্ছিল। শুনলাম তুমি নাকি ধারণা করেছ, ককটেলটা হ্যালুসিনোজেনিকস্ আর হিপনোটিকস মিশিয়ে তৈরি করা হয়েছে। তোমার ধারণা মিথ্যে নয়। রোগিণী যখন জ্ঞান হারাতে শুরু করে, কেউ একজন প্রচুর খাটাখাটনি করে তার মনে জটিল সব আইডিয়া ঢুকিয়ে দিয়েছে।'

ডোনার অবস্থা, প্রফেসরের ভাষায়, ক্রমশ উন্নতির দিকে। 'তবে এখনও বিপদ থেকে মুক্ত নয় সে।' রানার কাঁধে একটা হাত রেখে করিডরে বেরিয়ে এলেন ভদ্রলোক, ডোনার কাছে নিয়ে যাচ্ছেন ওকে। 'মাঝে-মধ্যে সম্পূর্ণ চেতনা ফিরে আসছে যেমন

আজ সকালের কথাই ধরো। প্রায় বিশ মিনিট সচেতন ছিল সে। দুর্বল, তবে নিজেকে চিনতে পারল, চিনতে পারল তার বাবাকে।' রানার চোখে প্রশ্ন, লক্ষ করলেন প্রফেসর। 'বিশ্রাম নিচ্ছেন ভদ্রলোক। তুমি খুব ভাল সময়ে পৌঁচেছ।' জানালেন, ইচ্ছে করলে আবার তিনি জ্ঞান ফেরাতে পারবেন ডোনার। 'একবার চেষ্টা করে সফল হয়েছি, তবে আবার পরীক্ষা করতে যাওয়াটা সম্ভবত ঝুঁকি নেয়া হয়ে যাবে। ওই অবস্থায় তার কথা শুনলে তোমার মনে হবে, কেউ যেন ভর করেছে তার ওপর–কোন অশুভ শক্তি। এ-ধরনের কেস আমার কাছে নতুন নয়। এমন কি গলার স্বরটাও বদলে যায়, মনে হয় অন্য কারও। প্রথমবার শুনে তো ভয়ই পেয়ে গিয়েছিলাম।'

'হ্যাঁ,' বলল রানা। 'আমিও শুনেছি, এখানে পাঠাবার আগে। খুব ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। অশুভ শক্তি বলতে আপনি ঠিক কি বোঝাতে চাইছেন আমি জানি।'

কামরাটা অন্যান্য যে-কোন হাসপাতাল কেবিনের মত। অ্যান্টিসেপটিকের গন্ধ ঢুকল নাকে। এক কোণে দাঁড়িয়ে রয়েছে অক্সিজেন সিলিন্ডার, আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি সহ। আরেক ধারে ওয়াশবেসিন। জানালাগুলোয় ভারী পর্দা ঝুলছে। ছোট্ট একটা বিছানায় শুয়ে রয়েছে ডোনা, বালিশে কাত হয়ে থাকা মুখটা ম্লান। এখনও তাকে স্যালাইন দেয়া হচ্ছে।

বিছানার পাশ থেকে সিধে হলো একজন নার্স। তার দিকে ফিরে একশো সিসি কি যেন চাইলেন প্রফেসর, নামটা আগে কখনও শোনেনি রানা।

'প্রফেসর,' বলল রানা, 'ঝুঁকিটা কি খুব মারাত্মক হয়ে যাবে,

আরেকবার ওর জ্ঞান ফিরিয়ে আনলে?'

'তুমি যদি চাও তো আরেকবার চেষ্টা করে দেখতে পারি আমি। হয়তো দু'একটা প্রশ্নের উত্তরও দিতে পারবে।'

'প্লীজ, প্রফেসর।'

হাসলেন প্রফেসর ওয়েদারবাই। 'তুমি যে অনুরোধ করবে, জানতাম।' পায়ের শব্দ শুনে ঘাড় ফেরালেন তিনি। ইস্পাতের তৈরি একটা কিডনি বেসিন নিয়ে ভেতরে ঢুকল নার্স, বেসিনে ইঞ্জেকশন দেয়ার সমস্ত সরঞ্জাম রয়েছে। ইঞ্জেকশনটা তৈরি করে প্রফেসরের হাতে ধরিয়ে দিল সে।

'বাইরে অপেক্ষা করো তুমি,' নার্সকে বললেন প্রফেসর। 'লর্ড চেস্টারফিল্ড যদি ফিরে আসেন, কেবিনের কাছে ঘেঁষতে দেবে না তাঁকে। নিজেও নার্ভাস ফিল করবেন, মেয়েকেও অস্থির করে তুলবেন।' মাথা ঝাঁকিয়ে কামরা থেকে বেরিয়ে গেল নার্স।

রানার দিকে ফিরলেন প্রফেসর। 'মনে রেখো, এবারই শেষ,' বললেন তিনি। 'শুধু মি. লংফেলো তোমাকে পাঠিয়েছেন বলে কাজটা করছি। কাজেই, যদি কিছু জানার থাকে তোমার, এখনই সুযোগটা নিতে হবে তোমাকে। তার অবচেতন মনে যা কিছু গছানো হয়েছে, এক সময় সবই ভুলে যাবে সে।' ডোনার ওপর ঝুঁকলেন তিনি, ইঞ্জেকশন দেয়ার পর সিধে হলেন, পিছিয়ে এলেন এক পা। 'দেখা যাক।'

হিপ পকেট থেকে একটা মিনি রেকর্ডার বের করল রানা, বিছানার পাশের টেবিলে রাখল। ছোট ফেল্ট ব্যাগটা খুলে ভেতর থেকে বের করল শক্তিশালী মাইক্রোফোন আর বুস্টার, জ্যাকের ভেতর প্লাগ ঢোকাল। টেপ চেক করে মেশিনটা অন করল ও।

'ডোনা!' প্রায় গর্জে উঠলেন প্রফেসর ওয়েদারবাই। 'চোখ মেলো, ডোনা! দেখো তোমার সাথে কথা বলার জন্যে কে এসেছেন! ডোনা!'

নড়ে উঠল মেয়েটা, গোঙাল, বালিশের ওপর এপাশ-ওপাশ করল মাথাটা। দেখে মনে হলো, ঘুমের মধ্যে নড়াচড়া করছে সে, স্বপ্নের ভেতর অনিশ্চিত বোধ করছে।

'ডোনা,' কোমল সুরে ডাকল রানা।

'তোমাকে কঠিন হতে হবে,' বিছানার আরেক দিক থেকে বললেন প্রফেসর ওয়েদারবাই।

'ডোনা!'

এবার গোঙানির শব্দ বাড়ল, কেঁপে উঠল চোখের পাতা। তারপর শোনা গেল সেই রোমহর্ষক কণ্ঠস্বর, 'সত্যদর্শীরা দুনিয়াটা দখল করে নেবে!' দৃঢ় প্রতিজ্ঞার মত নয়, নয় উল্লসিত ঘোষণা, শুনতে লাগল হুমকির মত।

'কিভাবে, ডোনা? দুনিয়াটা কিভাবে দখল করে নেবে সত্যদর্শীরা?'

'সত্যদর্শীরা–দখল–করে–নেবে–দুনিয়া!' চাপাকণ্ঠ, না মেয়েলি না পুরুষালি।

'কিভাবে দখল করে নেবে, ডোনা?'

'রক্ত ঝরিয়ে!'

'রক্ত...ঝরিয়ে?'

তারপর, অত্যন্ত ধীরে ধীরে, যেন শব্দগুলোকে টেনে টেনে বের করা হচ্ছে, প্রতিটি অসম্ভব ভারী, যেন গভীর কোন খাদ থেকে। '–বাবাদের–রক্ত–ঝরবে– সন্তানদের–ওপর!'

‘বলে যাও, ডোনা।’

বলার ভঙ্গিটা আগের চেয়ে দ্রুত হলো, যেন ঢিলেঢালা ভাবটুকু টান টান হয়ে গেছে, শব্দগুলো যেন হুটোপুটি করে বেরিয়ে আসতে লাগল, ‘সন্তানদের ওপর রক্ত ঝরবে বাবাদের। রক্ত ঝরবে মায়েদেরও। এভাবেই ঘুরতে শুরু করবে প্রতিশোধের চাকা!’

‘আরও বলো!’ চিৎকার করল রানা। ‘আরও শোনাও আমাদের! সত্যদর্শীরা দখল করে নেবে দুনিয়াটা সন্তানদের ওপর রক্ত ঝরবে বাবাদের। তারপর, ডোনা?’

‘রক্ত ঝরবে মায়েদেরও। এভাবেই ঘুরতে শুরু করবে প্রতিশোধের চাকা।’

‘বলে যাও!’

গুঙিয়ে উঠল ডোনা, মাথাটা এদিক ওদিক গড়াচ্ছে।

‘বলো! ডোনা! বলো!’ গর্জে উঠলেন প্রফেসর।

‘সত্যদর্শীরা দখল করবে! সত্যদর্শীরা জন্মস্থানে যাবে!’ রোমহর্ষক হাসি শোনা গেল। ‘হ্যাঁ,’ হিস্টিরিয়াগ্রস্ত রোগিণীর মত শোনাল পরের কথাগুলো, যেন অন্য কোন দুনিয়া থেকে ভেসে আসছে আওয়াজটা। ‘হ্যাঁ-হ্যাঁ। সত্যদর্শীরা জন্মস্থানে বেড়াতে যাবে! জন্মস্থান। পবিত্র জন্মস্থান!’ ক্রমশ নিস্তেজ হয়ে এল গলাটা, হাঁপাচ্ছে ডোনা, শ্বাস টানতে কষ্ট হচ্ছে তার।

‘যথেষ্ট, আর নয়।’ আরেকটা ইঞ্জেকশন নিয়ে ডোনার ওপর ঝুঁকে পড়লেন প্রফেসর। এক মিনিটের মধ্যে শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়মিত হয়ে উঠল মেয়েটার, দূর হয়ে গেল অস্থির ভাব। ‘কি বুঝলে, রানা?’ জানতে চাইলেন তিনি।

‘কিছুই না।’ রেকর্ডার তুলে নিয়ে টেপটা রিওয়াইন্ড করল রানা। গলার আওয়াজ রেকর্ড হয়েছে কিনা দ্রুত পরীক্ষা করল ও, তাড়াতাড়ি অফ করল সুইচ। আওয়াজটা দ্বিতীয়বার শোনার কোন ইচ্ছেই ওর নেই, কারণ যত শক্ত মনেরই অধিকারী হও তুমি, এ-ধরনের আধিভৌতিক গলা শুনলে অবশ্যই হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে আসবে ভয়ে। ‘কিছুই না,’ আবার বলল ও। ‘টেপটা মি. লংফেলোকে দেব, এক্সপার্টরা কি বলে দেখা যাবে। কিন্তু আপনি কি বলেন, প্রফেসর? আপনি কিছু বুঝলেন?’

বিখ্যাত নিওরোলজিস্ট মাথা নাড়লেন। ‘আমার কাছে প্রলাপ বলে মনে হয়েছে,’ বিড়বিড় করলেন তিনি। ‘প্রলাপ, তবে অশুভ।’

প্রফেসরের খাস কামরায় এসে বিশেষ একটা নম্বরে ডায়াল করে মারভিন লংফেলোর সাথে কথা বলল রানা। ডোনার মুখ থেকে শোনা কথাগুলো পুনরাবৃত্তি করল না। ফোন লাইনটাকে সম্পূর্ণ নিরাপদ বলে মনে করার কোন কারণ নেই। তাছাড়া, হেরিফোর্ড থেকে আসার পথে পিছনে ফেউ লাগার ঘটনাটার এখনও কোন সন্তোষজনক ব্যাখ্যা পায়নি ও। ক্লিনিকে আসার পথে অত্যন্ত সতর্ক ছিল, যদিও সন্দেহজনক কিছুই চোখে পড়েনি।

‘তাহলে ফিরে এসো, রানা,’ মারভিন লংফেলো বললেন। তারপর, যেন হঠাৎ মনে পড়ে গেছে, ‘বার্ডও ফিরে আসার পথে রয়েছে। তুমি বরং তোমার রেডিও আমাদের ফ্রিকোয়েন্সিতে অন করে রাখো, হঠাৎ কিছু জানাবার দরকার হতে পারে। তোমাকে হয়তো একবার প্যাঙবোর্নেও যেতে হতে পারে, বলা যায় না।’

পাঁচটার খানিক পর প্রফেসরের কাছ থেকে বিদায় নিল রানা। লক্ষ করল, এখনও তিনি অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন ওর দিকে। নিজের গাড়িতে ফিরে এসে রেডিওটা অন করল ও।

পৌনে এক ঘণ্টা পর, এমথ্রি ধরে লন্ডনে ঢুকছে রানা, হঠাৎ জ্যান্ত হয়ে উঠল গাড়ির রেডিও। 'মাছরাঙা। মাছরাঙা সাড়া দাও। কাঠঠোকরা ডাকছে মাছরাঙাকে। সাড়া দাও।'

নিজের কল সিগন্যাল চিনতে পারল রানা। সীটের তলায় হাত গলিয়ে মাইকটা বের করে আনল, কথা বলল মাউথপীসে, 'মাছরাঙা। মাছরাঙা কাঠঠোকরাকে ডাকছি। রিসিভিং স্ট্রেংথ সিক্স। ওভার।' মেসেজটা কি হবে রানার কোন ধারণা নেই।

'মাছরাঙা,' অপরপ্রান্ত থেকে ভেসে এল, সেই সাথে শুরু হলো উদ্বেগ আর উত্তেজনা। 'তিন কন্যার কাছে যাও। আর্জেন্ট কোড ওয়ান। বুদ্বুদ। তিনটে গাছের গুঁড়ি আর একটা আধপাকা ফল। কাকতাড়ুয়ারা হাঁটা দিয়েছে।'

তীক্ষ্ণকণ্ঠে 'রজার' বলে বেন্টলির গতি বাড়িয়ে দিল রানা, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কিলবার্নে, নিনি খন্দকারের কাছে পৌঁছুতে হবে ওকে। তিনকন্যা হলো কিলবার্নের সেফ হাউস। আর্জেন্ট কোড ওয়ান অর্থাৎ ভয়ানক কাণ্ড ঘটে গেছে। বুদ্বুদ মানে আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করা হয়েছে। তিনটে গাছের গুঁড়ি আর একটা আধপাকা ফল–কমপক্ষে তিনজন নিহত হয়েছে, আহত হয়েছে একজন। পুলিস অকুস্থলের পথে রওনা হয়ে গেছে, বোঝা গেল কাকতাড়ু য়ারা হাঁটা দেয়ায়।

শহরের ভেতর দিয়ে দ্রুতবেগে গাড়ি চালাবার সময় একটা চিন্তাই বার বার ফিরে এল রানার মনে, তিনটে লাশের মধ্যে নিনি

খন্দকার নেই তো? একটা ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই, কিলবার্ন অর্থাৎ বি. এস.এস-এর নিজের জায়গায় হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে। বাবাদের রক্ত, মনে পড়ে গেল রানার। রক্ত ঝরবে মায়েদেরও। কোথায় যেন বেঈমানীর একটা ঘটনা ঘটছে—প্রথমে হেরিফোর্ড থেকে লন্ডনে আসার পথে, তারপর অত্যন্ত নিরাপদ বলে বিবেচিত সেফ হাউসে।

নয়

কিলবার্ন এলাকাটা এক সময় নিচু জলাভূমি ছিল। সামান্য কিছু জায়গায় চাষীরা ফসল ফলাত, বেশিরভাগই পানির নিচে অবহেলায় ডুবে ছিল। শহরে জনসংখ্যা উপচে পড়ায় স্বল্প আয়ের লোকজন সস্তায় বাসযোগ্য জমির সন্ধানে কিলবার্নের দিকে আসতে শুরু করে। তারপর কেটে গেছে বিশ-পঁচিশটা বছর, কিলবার্নকে দেখে এখন আর চেনার উপায় নেই। প্রায়োরি রোড থেকে ঢাল বেয়ে নেমে গেছে একটা রাস্তা, এলাকাটা এখনও নিচুই আছে, তবে এখন আর এটাকে জলাভূমি বলা চলে না। এলোমেলো ভাবে অনেকগুলো রাস্তা তৈরি হয়েছে, কোথাও ইঁট বিছানো হয়েছে, কোথাও হয়নি। রাস্তার পাশে ছোটখাট বাড়ি, হোটেল রেস্তোরাঁ। আরও খানিক এগোলে কিছু ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্লট দেখা যাবে। প্লটগুলোকে ছাড়িয়ে খানিকদূর এগোলে দেখা যাবে সার সার মিনিবাস আর ট্রাক দাঁড়িয়ে আছে—কোনটা সম্পূর্ণ অচল,

কোনটা মেরামতযোগ্য। গ্যারেজগুলো শুরু হয়েছে এখান থেকেই। ছোট বড় বিভিন্ন আকারের গ্যারেজ, কোনটা টিন শেড, কোনটা পাকা। বেশিরভাগ গ্যারেজই বন্ধ পড়ে থাকে। এদিকে লোকবসতি নেই বললেই চলে, ফলে দিনের বেলাতেও ভৌতিক লাগে পরিবেশটা।

পাশাপাশি চারটে গ্যারেজের একজনই মালিক, আশপাশের গ্যারেজ মালিক বা মিস্ত্রীরা কেউ তাকে কখনও দেখেনি বা তার সম্পর্কে কিছু শোনেনি। ছোট্ট, দোতলা একটা বাড়ির পিছন দিকে গ্যারেজগুলো তালামারা থাকে বলে কারও কোন আগ্রহও নেই। চারটে গ্যারেজ, মাঝখানে দরজা থাকায় একটা থেকে আরেকটায় যাওয়া যায়। দুটো গ্যারেজের পিছন দিকেও একটা করে ছোট দরজা আছে।

এই দরজা দুটো দিয়ে ছোট একটা পাকা ঘরে ঢোকা যায়। ঘরটার উল্টোদিকে রয়েছে ইস্পাতের তৈরি একটা দরজা, ডিজিটাল কমবিনেশন লক ব্যবহার করা হয় সেটায়। কেউ যদি ইস্পাতের দরজাটা খুলতে পারে, দোতলা বাড়িটার পিছনের অংশে নিজেকে দেখতে পাবে সে। বি.এস.এস. সেফ হাউসের এটাই প্রধান প্রবেশপথ। বাড়িটার সামনের দরজা ভেতর থেকে ইস্পাতের মোটা পাত লাগিয়ে মজবুত আর দুর্ভেদ্য করা হয়েছে। বাড়িটা থেকে নিয়মিত যাদেরকে বেরুতে বা ঢুকতে দেখা যায় তাদেরকে সবাই ভাড়াটে বা দারোয়ান বলেই জানে। আসলে তারা বি.এস.এস-এর নিরাপত্তা রক্ষী। অন্যান্য যারা এখানে আসে, আসে পিছনের পথ দিয়ে, কখনোই কেউ তাদেরকে আসতে বা চলে যেতে দেখে না।

বাইরে থেকে দেখে মনে হবে, বাড়িটার মেরামত বা যত্ন করা হয় না। জানালা-দরজায় রঙ নেই, দেয়ালগুলোর প্লাস্টার খসে পড়েছে। কেউ জানে না বন্ধ জানালার ভেতর দিকে ইস্পাতের অতিরিক্ত কবাট আছে, দেয়ালগুলো পুরু ও শক্ত করা হয়েছে ভেতর থেকে পাথরের গাঁথনি তুলে, কামান দাগলেও ফেলা যাবে না। এলাকার লোকেরা জানে, বাড়ির মালিক মাত্র দুটো ঘর ভাড়া দিয়েছে, বাকি ঘরগুলো খালি ফেলে রাখা হয়েছে।

আসলে তা নয়। বাড়িটার দশটা কামরা সাউন্ডপ্রুফ। দুটো বাথরুম অত্যাধুনিক। কিচেনটা যে-কোন গৃহিণীর মনে ঈর্ষার উদ্রেক করবে। কিচেনে দুটো ফ্রিজ। শোবার ঘরে ফোমের বিছানা। বসার ঘরে আরামদায়ক চেয়ার আর সোফা।

দিনের প্রথমভাগে নিনি খন্দকারকে নিয়ে গ্যারেজ হয়ে বাড়িটায় ঢুকেছিল রানা। কেয়ারটেকার দু'জনকে চেনে ও, গত এক বছর ধরে এখানে দায়িত্ব পালন করছে মাইকেল আর হফম্যান। দু'জনেই সামরিক বাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারী, বি.এস.এস. পরিচালিত বিশেষ বডিগার্ড কোর্স শেষ করেছে।

নিনি খন্দকারকে হাতে পেয়ে ওদের দু'জনের মধ্যে প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেল, কে তাকে কত বেশি সম্মান দেখাতে পারে, আর যত্নের ঠেলায় অতিষ্ঠ করে তুলতে পারে প্রাণ। তাই বলে কেউ তার আসল দায়িত্ব ভুলে বসল না।

নিনি খন্দকারের ঠিকানা জেনে নিয়েছে রানা, কেনসিংটনের একটা অ্যাপার্টমেন্ট ভবনে থাকে সে। কাপড়চোপড় বা অন্য কোন জিনিস দরকার হলে একজন মহিলা নিরাপত্তা রক্ষীকে পাঠিয়ে আনিয়ে দেয়া যাবে, এই ভেবে ঠিকানাটা মুখস্থ করে

নিয়েছে রানা।

রানা বিদায় নেয়ার পর নিনি খন্দকারকে বাথরুম, শোবার ঘর, সিটিংরুম ইত্যাদি দেখিয়ে দিল ওরা। দু'জনেই তাকে সম্বোধন করল ম্যাডাম বলে। সুযোগ পেলেই দু'জনের কেউ না কেউ তার আশপাশে ঘুর ঘুর করছে। তবে একটানা বেশিক্ষণ তার কাছাকাছি থাকা দু'জনের কারও পক্ষেই সম্ভব নয়।

রুটিন ধরে কাজ করতে হয় ওদেরকে। একজনের ডিউটি থাকে অপারেশন রুমে। ছ'টা মনিটর স্ক্রীনে বাড়িটার সামনের রাস্তা আর চারদিকের দালান-কোঠা দেখা যায়। বাড়ির ভেতরও একাধিক ক্যামেরা কাজ করছে, কোথাও অস্বাভাবিক কিছু ঘটলেই পর্দায় তা ধরা পড়বে। নিনি খন্দকার আসার খানিক পর মাইকেলের পালা শুরু হলো। বোতামে চাপ দিয়ে নিনির বেডরুমের ক্যামেরাটা চালু করল হফম্যান, মনিটরে ফুটে উঠল পুরো কামরার ছবি।

এরপর শুরু হলো হফম্যানের পালা। তাকে বাড়িতে রেখে হাঁটতে হাঁটতে মেইন রোডে চলে এল মাইকেল, নিনি খন্দকারের জন্যে কিছু পত্র-পত্রিকা কিনবে। একটা মেয়ে শুধু গান শুনে সময় কাটায় কিভাবে!

মাইকেলের কেনা পত্র-পত্রিকা আর বইগুলো দেখে খুশিই হলো নিনি খন্দকার। তাকে আন্তরিক ধন্যবাদ দিল।

সন্ধ্যা পৌনে ছ'টার সময় মাইকেল এসে জিজ্ঞেস করল, ম্যাডামের বেডরুমে চা দিতে হবে কিনা। মৃদু হেসে নিনি বলল, 'একা একা ভাল লাগছে না, চলো তোমার সাথে নিচে যাই, ওখানে একসাথে চা খাব।'

নিচে নেমে এসে কিচেনের পাশের কামরায় বসল নিনি, সেফ হাউসের ডাইনিং রূম হিসেবে চালানো হয় এটাকে। নিনি লক্ষ করল, মাইকেলের চায়ের কাপটা প্রকাণ্ড, তার চা-ও অত্যন্ত কড়া আর ঘন। চা খাবার নাম করে মাখন দেয়া কয়েক পিস পাউরুটিও খেলো সে, পরিমাণে রুটির চেয়ে মাখনই বেশি হবে।

ওপরের অপারেশন রূম থেকে হফম্যান দেখল, লাল রঙের বড় একটা পোস্ট অফিস ভ্যান বাড়িটার সামনে ব্রেক কষে দাঁড়িয়ে পড়ল। সাথে সাথে সতর্ক হয়ে উঠল সে।

মুখভর্তি রুটি, হাতে চায়ের কাপ, কাপে চুমুক দিতে গিয়ে বাধা পেল মাইকেল, তার পোর্টেবল রেডিও হঠাৎ জ্যান্ত হয়ে উঠেছে। ওপরতলা থেকে হফম্যান তাকে জানাল, 'বাড়ির সামনে পোস্ট অফিস ভ্যান। সেই আগেরটাই মনে হচ্ছে, কিন্তু সময়টা মিলছে না—এই সময় তো হেডকোয়ার্টার থেকে চিঠিপত্র বা কোন কাগজ পাঠানো হয় না।' এর আগেও এটা বা এ-ধরনের একটা ভ্যান হেডকোয়ার্টার থেকে পাঠানো হয়েছে।

ট্র্যান্সমিট করার জন্যে রেডিওর বোতামে চাপ দিল মাইকেল। 'আমি দেখছি,' ঘন ঘন ঢোক গেলার মাঝখানে বলল সে। 'আমাদের অতিথির কোন ব্যাপার হতে পারে।'

হলরূমে কলিং বেল বেজে উঠল। মাইকেলের হাতে একটা অটোমেটিক পিস্তল বেরিয়ে এল। পিস্তল ধরা হাতটা উরুর পিছনে নামিয়ে দরজার সামনে দাঁড়াল সে, আগন্তুকের পরিচয় জানতে চাইল। তার উচ্চারিত শব্দগুলো হুবহু এরকম, 'কে, ইস্টম্যান নাকি?'

সাংকেতিক উত্তরটা কি হবে জানা আছে মাইকেলের। 'মি.

জেমসের তরফ থেকে জরুরী একটা ডেলিভারি।' মাইকেল তখন বলবে, 'ঠিক আছে, আমি তার ছেলে।' আজকের সাংকেতিক কথাবার্তা এরকমই নির্ধারণ করা হয়েছে।

তার বদলে অচেনা কণ্ঠস্বর থেকে ভেসে এল, 'রেজিস্ট্রি করা একটা প্যাকেট নিয়ে এসেছি। ঠিকানাটা ঠিকই আছে, তবে নামটা পড়তে পারছি না।'

'তাহলে কাল সকালে এসো,' বলল মাইকেল, ইতোমধ্যে পিস্তলের সেফটিক্যাচ অফ করেছে সে, লক্ষ্যস্থির করেছে দরজার ওপর। তিন পা পিছিয়ে এল সে, এই সময় রেডিও থেকে হফম্যানের চিৎকার ভেসে এল, 'সাবধান, মাইকেল! ওরা চারজন! আমি নিচে আসছি!'

হাত-ইশারায় নিনিকে হলরুম থেকে সরে থাকতে বলল মাইকেল, ঠিক এই সময় এক পশলা গুলি আঘাত করল দরজায়। দরজার কোন ক্ষতি হলো না, বুলেটগুলো ছিটকে ফিরে গেল বারান্দায় দাঁড়ানো চারজন আগন্তুকের দিকে। ওদের জানা নেই, পাঁচ ইঞ্চি পুরু আর্মার-প্লেট ইস্পাত দিয়ে মোড়া রয়েছে কবাট দুটো।

ফিরতি বুলেটের অংশবিশেষ মুখে আঘাত করায় চারজনের একজন মুখে হাত চাপা দিয়ে বসে পড়ল, আঙুলের ফাঁক দিয়ে রক্ত গড়াচ্ছে। বাকি তিনজন তিনটে কুঠার নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল দরজার ওপর, অনবরত ঘা মারল কবাটের ওপর। তাতেও তেমন কোন লাভ হলো না।

'শালার দরজা!' বাইরে একজনের চিৎকার শোনা গেল। 'কি এটা, ব্যাংকের স্ট্রং রুম? তোলো, ওকে তোলো! ভেতরে ঢোকা

সম্ভব নয়!' আহত লোকটা ইতোমধ্যে বারান্দায় শুয়ে গড়াগড়ি খাচ্ছে।

সিঁড়ির মাথায় এসে আবার ফিরে গেল হফম্যান, অপারেশন রূম থেকে বারান্দাটা মনিটরে দেখবে। কিন্তু গুলি লেগে বারান্দার ক্যামেরাটা চুরমার হয়ে যাওয়ায় স্ক্রীনে কোন ছবি নেই। লাল একটা বোতামে চাপ দিল সে, নিকটবর্তী থানায় অ্যালার্ম বেজে উঠবে। আবার সিঁড়ির মাথায় ফিরে এসে চিৎকার করে বলল, 'সাবধান, মাইকেল! বাইরে কি ঘটছে জানি না!'

দরজার বাইরে আগন্তুকরা প্রস্থানের প্রস্তুতি নিচ্ছে বুঝতে পেরে মাইকেলের মনে একটা জেদ চেপে গেল। লোকগুলোকে পালাতে দেবে না। বোতাম টিপে অটোমেটিক বোল্ট রিলিজ করল সে, পায়ের ধাক্কায় দরজার কবাট উন্মুক্ত করল, দু'হাতে ধরা অটোমেটিকটা তুলছে।

শটগান বিস্ফোরণের পুরোটা ধাক্কা বুক পেতে গ্রহণ করল মাইকেল। ছিটকে হলরূমের মাঝখানে চলে এল সে। দরজার সামনে দু'জন আগন্তুক রয়ে গিয়েছিল এবার তারা লাফ দিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ল, হাতে তৈরি হয়ে আছে মারাত্মক শটগান।

সিঁড়ির মাথা থেকে আগেই ল্যান্ডিং লাইটটা জ্বেলে দিয়েছে হফম্যান। প্রথম আগন্তুককে চিরনিদ্রায় পাঠাল সে, তার একজোড়া গুলি লোকটার খুলির ওপরের অংশ উড়িয়ে নিয়ে গেছে। দ্বিতীয় শত্রু শটগানটা উঁচু করল, কিন্তু ট্রিগারে চাপ দেয়ার আগেই গুলি খেলো বুকে। নাচের ভঙ্গিতে এদিক-ওদিক পা ফেলল সে, তারপর দড়াম করে পড়ে গেল মেঝের ওপর, বিস্ফোরিত হলো হাতের শটগান, একরাশ প্লাস্টার খসে পড়ল

হলরূমের সিলিং থেকে।

মাইকেল তাকে সরে থাকতে বললেও, উঁকি দিয়ে হলরূমের ভেতর তাকিয়ে ছিল নিনি।

হলরূমের মাঝখানে মাইকেলকে ছিটকে পড়তে দেখে সাহায্যের জন্যে ছুটে গেল সে। মাইকেল মারা গেছে বুঝতে পেরে মেঝে থেকে তার পিস্তলটা তুলে নিল।

বাকি দু'জন লোক রাস্তায় পৌঁছে গেছে ইতোমধ্যে। আহত লোকটাকে ভ্যানে উঠতে সাহায্য করছে অপরজন। তার দিকে পর পর দুটো গুলি করল হফম্যান, লক্ষ্যভেদ করার জন্যে নয়–লোকটাকে নিরস্ত্র বলে মনে হয়েছে তার–দেখল, লাল ভ্যানের পাশে একজোড়া গর্ত তৈরি করে ভেতরে ঢুকে গেল বুলেট দুটো।

লোকটাকে ছেড়ে দিল তার সঙ্গী, রাস্তায় পড়ে গোঙাতে লাগল সে। লাফ দিয়ে ভ্যানে উঠল দ্বিতীয় লোকটা, স্টার্ট দেয়া গাড়ি ছেড়ে দিল। সাথে সাথে এঁকেবেঁকে, যেন মাতাল কোন ড্রাইভার চালাচ্ছে ওটা, ছুটল ভ্যান। দূর থেকে ভেসে এল পুলিস পেট্রল কারের ওঁয়া ওঁয়া শব্দ।

সতর্কতার সাথে গ্যারেজের ভেতর দিয়ে অকুস্থলে পৌঁছুল রানা। ইতোমধ্যে লাশগুলো সরিয়ে ফেলা হয়েছে, আহত লোকটাকে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে শহরের একটা বি.এস.এস. ক্লিনিকে। পুলিসের একটা গাড়ি এখনও দাঁড়িয়ে রয়েছে বাড়ির সামনে। ভেতরে, নিচতলার সিটিংরূমে দেখা গেল জন মিচেল আর পুলিস সুপারিনটেনডেন্ট উইলবার জেফারসনকে–আগের দিন তার দ্বারাই গোটা ব্যাপারটার সূচনা ঘটেছিল–হফম্যান আর

নিনি খন্দকারের বক্তব্য শুনছে। ওদের দু'জনকেই সন্ত্রস্ত আর স্তম্ভিত লাগল রানার, বিশেষ করে নিনিকে। ইউনিফর্ম পরা দু'জন পুলিস অফিসার আর সাদা পোশাকে একজন ডাক্তারকেও দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল।

'আর কোন ভয় নেই,' সিটিংরূমে ঢুকে সরাসরি নিনির কাছে চলে এল রানা, তার কাঁধে একটা হাত রাখল। 'তুমি ঠিক আছ তো?' অনিশ্চিত ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল মেয়েটা, তারপর সাহস হারায়নি বোঝাবার জন্যে জোর করে সামান্য হাসল, হাসিটা দেখে আজকের দিনটাই যেন বদলে গেল রানার। নিজেকে সতর্ক করে দিল ও, যথেষ্ট সাবধান হতে না পারলে কপালে খারাবি আছে। এ-ধরনের দুর্বলতা অনুমোদনযোগ্য নয়, বিশেষ করে এখনও যখন নিনি খন্দকার একটা অজানা রহস্য, তদন্ত সাপেক্ষ চরিত্র।

'ঘটনার নিখুঁত একটা বর্ণনা দিয়েছেন উনি,' প্রায় কর্কশস্বরে বলল মিচেল। 'তবে বাড়িটা আর কোন কাজে আসবে না।'

'কে দায়ী?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'কে আবার, তুমি!' কঠিনসুরে অভিযোগ করল মিচেল। 'বস্ অন্তত তাই বলছেন!' রানার দিকে ঠাণ্ডা চোখে তাকিয়ে আছে সে। দু'জনের মধ্যে গভীর বন্ধুত্ব, তবে মাপজোক করে কথা বলা মিচেলের স্বভাব নয়। 'হয় তুমি, নয়তো তোমার বান্ধবী নিনি খন্দকার।'

'বোকার মত কথা বোলো না!' খেঁকিয়ে উঠল রানা।

'কথাটা বসের, আমার নয়। তবে আমাকেও চিন্তায় ফেলে দিয়েছে।'

'আজ সকালে নিনিকে এখানে আনার সময় কেউ আমাকে

ফলো করেনি। কেউ না। ট্যাক্সি করে আসি আমরা, একমাইল দূরে থাকতে ড্রাইভারকে বিদায় করে দিই, বাকি পথটা হেঁটে এসেছি। পিছনটা বারবার দেখেছি আমি, কেউ ছিল না।' হফম্যানের দিকে ফিরল রানা। 'নিনি কোথাও ফোন করেছিল?'

সভয়ে আঁৎকে ওঠার শব্দ করে রানার দিকে ফিরল নিনি খন্দকার। 'রানা, তুমি নিশ্চয়ই বিশ্বাস করো না...'

'করেছিল?' নিনির দিকে রানা তাকাল না।

'না,' ইতস্তত করে বলল হফম্যান। তারপর দৃঢ়তার সাথে, 'না। ফোন করার কোন সুযোগ ম্যাডামের ছিল না।'

'গুড।' মিচেলের দিকে ফিরল রানা। 'কাজেই, দোষটা আমার, কেমন?'

'আপাতত।'

'কি নির্দেশ দেয়া হয়েছে?'

'এখানের কাজ শেষ হলে, পুলিস সুপার আর আমি হেডকোয়ার্টারে ফিরে যাচ্ছি, তোমারও আমার সাথে যাবার কথা। ডিব্রিফিং। তোমার সাথে মিস নিনিও যাবেন। তোমরা দু'জনেই।'

ভুরু কোঁচকাল রানা। 'আমাকে মেসেজ দেয়া হয়েছে–তিনটে গাছের গুঁড়ি। কারা তারা?'

'দু'জন আগন্তুককে খতম করেছে হফম্যান। কালো জাম্পস্যুট আর হুড পরে ছিল তারা। তাদের হাতে মারা গেছে মাইকেল।'

'ওহ্ গড!'

'আজ রাতে একটা টীম আসছে এখানে। সমস্ত কিছু সরিয়ে ফেলা হবে। সংবাদ মাধ্যমকে গছাবার জন্যে একটা গল্প তৈরি হচ্ছে হেডকোয়ার্টারে।'

'তিনটে গাছের গুঁড়ি আর একটা আধপাকা ফল—আধপাকা ফলটা কে?'

'তাকে ইন্টারোগেশনের জন্যে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। বুলেটের ছিটা লেগেছে মুখে। দরজায় শটগান দিয়ে গুলি করে তারা।'

এক মুহূর্ত চিন্তা করল রানা, মনে পড়ে গেল ডোনা চেস্টারফিল্ড ক্লিনিকে রয়েছে। 'জন,' হাত-ইশারায় তাকে এক কোণে সরিয়ে আনল ও। 'শোনো, আধপাকা ফলটা কোথায়?'

'লন্ডন ক্লিনিকে, কড়া পাহারায় রাখা হয়েছে।'

'আমার একটা উপকার করতে পারো?'

'আগে শুনি কি চাও।'

'আমার ওপর কি রকম খেপেছেন মি. লংফেলো? সত্যি করে বলো।'

'বসের বিশ্বাস, নিনিকে তুমি এখানে নিয়ে আসাতেই বাড়িটা বাতিল হয়ে গেছে। কাজটা করার পর অনুমতি চেয়েছ তুমি, রানা। জানো তো, এ-ধরনের অনিয়ম কিভাবে নেন তিনি? উপকারের কথা কি যেন বলছিলে?'

'আধপাকা ফলটাকে কিছুক্ষণের জন্যে হাতে পেতে চাই আমি,' বলল রানা। 'কি অবস্থা তার, দেখা করা যায়?'

'ডাক্তাররা তার মুখ থেকে বুলেটের অনেকগুলো টুকরো সরিয়েছে। নার্ভাস তো বটেই, খুব শক-ও পেয়েছে। ডাক্তাররা জানিয়েছে, কাল তাকে ইন্টারোগেট করা যাবে।'

'আমি তাকে এখনই চাই।'

'তা বোধহয় সম্ভব হবে না।'

'জন, আমার ওপর বিশ্বাস রাখো,' আবেদনের সুরে বলল

রানা। 'ডোনার কথা শোনার জন্যে মি. লংফেলো আমাকে প্রফেসর ওয়েদারবাইয়ের কাছে পাঠিয়েছিলেন। টেপটা আমার পকেটে। বিশ্বাস করো, আমি ভীষণ অস্থিরতা বোধ করছি। ওই ব্যাটা আহত টেরোরিস্টকে আমার হাতে পাঁচ মিনিটের জন্যে ছেড়ে দাও। মাত্র পাঁচ মিনিট, তারপরই আমি মি. লংফেলোর সামনে দাঁড়াব। আমি জানি, তাঁকে তুমি মানিয়ে নিতে পারবে।'

'কি জানি,' এক মুহূর্ত পর কাঁধ ঝাঁকাল মিচেল। 'এত করে যখন বলছ...ঠিক আছে, ফোন করে দেখি। তবে আমি কোন কথা দিচ্ছি না।'

বিদায় নেয়ার জন্যে তৈরি হয়ে গেছে সবাই। ফোন করার জন্যে মিচেল বেরিয়ে যেতেই তাড়াতাড়ি দুটো কথা বলার জন্যে নিনির কাছে ফিরে এল রানা। 'তোমাকে একটা পরামর্শ দিই, নিনি,' বলল ও, নিনির খুব কাছে দাঁড়িয়ে আছে। এত কাছে, মেয়েটার চুল থেকে বারুদের গন্ধ পেল ও। দেখল, ধনুকের ছিলার মত টানটান হয়ে আছে একহারা শরীরটা। 'তোমাকে ইন্টারোগেট করবে অত্যন্ত দক্ষ ইন্টেলিজেন্ট এক্সপার্ট, সাতঘাটের পানি খাওয়া এক প্রৌঢ় লোক। ভুলেও একটা মিথ্যে কথা বলবে না। সত্যি কথা বললে তোমার কোন ভয় নেই। মনে থাকবে তো?'

আড়ষ্ট, নার্ভাস হাসি নিয়ে নিনি বলল, 'বুঝেছি। সাধ্যমত চেষ্টা করব আমি। চব্বিশ ঘণ্টায় দু'বার গুলি করা হয়েছে আমাকে লক্ষ্য করে। এ-ধরনের পরিস্থিতিতে আমি অভ্যস্ত নই।'

'অভ্যস্ত আমরা কেউ নই। এবার আসল কথায় আসি। সি. আই. এ-র হার্বার্ট রকসনকে চেনো তুমি, মার্কিন দূতাবাসের প্রেস

সেক্রেটারি? সত্যি কথা বলবে।’

নিনি ইতস্তত করল না। ‘হ্যাঁ। হ্যাঁ, চিনি তাকে।’

‘গুড। সে কি তোমার অপারেশনের কথা জানে?’

‘সে জানে আমি তার সাথে যোগাযোগ করতে পারি। আমি যদি সত্যিকার কোন বিপদে পড়ি, আমাকে সাহায্য করার কথা তার।’

‘ছেলেমানুষি কোরো না, নিনি, বিপদটাকে ছোট করে দেখো না! এবার শোনো, মি. লংফেলো যখন তোমাকে জেরা করবেন, হার্বার্ট রকসনকে তুমি চেনো বলে স্বীকার করবে না। কি বলছি বুঝতে পারছ? হার্বার্ট রকসনকে তুমি চেনো না। তার যে-কোন বন্ধু বি.এস.এস. চীফের শত্রু। এই একটা বাদে, বাকি সব বিষয়ে যা সত্যি তাই বলবে তুমি।’

‘ধন্যবাদ, রানা। মনে রাখব, চেষ্টা করব যাতে মনে থাকে।’ রানার কাঁধের ওপর দিয়ে, ওর পিছন দিকে তাকাল নিনি।

ঘাড় ফিরিয়ে রানা দেখল, হলরুমে ঢুকছে মিচেল।

‘তোমার আশা পূর্ণ হয়েছে,’ বলল মিচেল, তার চোখে ঝিক করে উঠল দুষ্ট হাসি, যেন দু’জন মিলে মিথ্যে একটা ষড়যন্ত্র পাকাচ্ছে। ‘তবে, বলেছেন, কোনমতেই পাঁচ মিনিটের বেশি নয়। ওখান থেকে সরাসরি হেডকোয়ার্টারে ফিরতে হবে তোমাকে।’

মাথা ঝাঁকাল রানা। ‘পরে দেখা হবে।’ ওর একটা হাত নিনির কাঁধ ছুঁয়ে গেল, এক সেকেন্ডের জন্যে চাপ দিল আঙুলগুলো। পরমুহূর্তে দীর্ঘ পদক্ষেপে বাড়ির পিছন দিকে এগোল ও, গ্যারেজ হয়ে বেরিয়ে যাবে বাড়ি থেকে।

আধ ঘণ্টা পর, বেন্টলি খানিক দূরে রেখে লন্ডন ক্লিনিকে

ঢুকল রানা।

আহত লোকটাকে রাখা হয়েছে চারতলায়, করিডরের ওদিকটায় কাউকে যেতে দেয়া হচ্ছে না। কয়েকজন দেহরক্ষী ও পুলিস অফিসার পাহারায় রয়েছে। বি.এস.এস-এর একজন দেহরক্ষী, নাম হার্ডি, চার্জে রয়েছে–দেখেই চিনতে পারল রানাকে। 'ডাক্তাররা ব্যাপারটা পছন্দ করছেন না, স্যার,' বলল সে। 'তবে বস্ হুকুম দিয়েছেন, তার সাথে আপনাকে পাঁচ মিনিট থাকতে দিতে হবে। ওই পাঁচ মিনিটই আমার কাছ থেকে পাবেন আপনি।'

'চমৎকার। ওই পাঁচ মিনিটই দরকার আমার।'

বিছানার পাশে সশস্ত্র একজন গার্ড রয়েছে, ওদেরকে কেবিনে ঢুকতে দেখে টুল ছেড়ে উঠে দাঁড়াল সে। 'তুমি থাকো,' বলল রানা। 'লোকটার কাছ থেকে আমি শুধু একটা কথা জেনে নেব।' পকেট থেকে রেকর্ডারটা বের করল ও, টেপটা আগেই রেকর্ড করার জন্যে তৈরি করা হয়েছে। মাইক ফিট করে বিছানার পাশে রাখল ওটা।

বিছানার ওপর রোগা, ছোটখাট এক লোক শুয়ে আছে, ড্রেসিং আর ব্যান্ডেজে ঢাকা পড়ে আছে মুখটা, শুধু দুই ঠোঁট আর একটা চোখ বাদে। চোখটা অনবরত নড়াচড়া করছে। দৃষ্টিতে ভয়।

বোতামে চাপ দিয়ে রেকর্ডার চালু করল রানা, সামনের দিকে ঝুঁকল, লোকটার কানের কাছে ঠোঁট নামিয়ে কথা বলল, 'মন দিয়ে শোনো, কেমন? তোমার কোন ক্ষতি হবে না। তোমার কাছে এলাম, কারণ আমি জানি সত্যদর্শীরা দুনিয়াটা দখল করে নেবে।'

নিঃসঙ্গ চোখটায় ব্যগ্র দৃষ্টি ফুটল, কেঁপে উঠল চারপাশের পেশী। 'কি বলছেন বুঝতে পারছি না,' ফিসফিস করে বাংলায় বলল লোকটা। আশ্চর্য হয়ে গেল রানা, লোকটার উচ্চারণে হিন্দীর টান অত্যন্ত স্পষ্ট।

'বুঝতে পারছ বৈকি। তুমি জানো সত্য সমিতির সদস্যরা দুনিয়াটা দখল করে নেবে। যেমন জানো, সন্তানদের ওপর রক্ত ঝরবে বাবাদের। রক্ত ঝরবে মায়েদেরও। আর এভাবেই ঘুরতে শুরু করবে প্রতিশোধের চাকা।'

'ভগবান, হায় ভগবান!' অকস্মাৎ রুদ্ধশ্বাসে ককিয়ে উঠল লোকটা। 'আপকো মালুম হ্যায়!'

'অবশ্যই জানি। শোনো, আমার একটা প্রশ্ন আছে।'

'সওয়াল?'

'সত্যদর্শীরা কোথায় যেন যাচ্ছে?'

'জন্ম স্থানে।'

'কেন যাচ্ছে?' চাপাকণ্ঠে জিজ্ঞেস করল রানা।

দীর্ঘ কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থাকল লোকটা, চোখটার অস্থিরতা আগের চেয়ে কমে গেছে। 'ক'টা বাজে বলুন তো?' হঠাৎ জানতে চাইল সে। তার গলাও আগের চেয়ে শান্ত।

হাতঘড়ির ওপর চোখ বুলাল রানা। 'সাড়ে ন'টা।'

আহত লোকটার ঠোঁট দুটো প্রসারিত হলো। হাসছে সে, 'বহুত দের হো চুকা। আপনি যে-ই হোন, অনেক দেরি করে ফেলেছেন। সত্য সমিতির সদস্যরা জন্মস্থানে পৌঁছে গেছে সাড়ে আটটায়।'

'আই সী।'

‘দেখবেন বৈকি।’ মাথা সামান্য একটু সরিয়ে এক চোখ দিয়ে ভাল করে তাকাল রানার দিকে। ‘দেখতে পাবেন। আবার দেখতে পাবেনও না। সত্যদর্শীরা দুনিয়াটা দখল করে নেবে, তবে শুধু জন্মস্থানে গিয়ে নয়।’ মুখ ফিরিয়ে নিল সে, বন্ধ করল চোখটা।

রেকর্ডারের সুইচ অফ করল রানা, হার্ডি আর সশস্ত্র দেহরক্ষীর উদ্দেশে মাথা ঝাঁকাল, ঘুরে দাঁড়িয়ে এগোল দরজার দিকে। করিডর ধরে খানিকদূর চলে এসেছে, পিছনে পায়ের আওয়াজ শুনতে পেল ও, এগিয়ে আসছে দ্রুত।

লোকটা হার্ডি। হাত ইশারায় থামতে বলছে ওকে।

‘খবর খুব খারাপ, স্যার।’

‘কিসের খবর?’

‘বুড়ো লর্ড সেফারস্।’

‘লর্ড সেফারস? তার...কি?’ ইংল্যান্ডে এমন কোন লোক নেই যে লর্ড সেফারসকে চেনে না বা শ্রদ্ধা করে না, তাদের রাজনৈতিক বিশ্বাস যাই হোক না কেন। ভদ্রলোক দু’দু’বার প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হয়েছেন, সৎ সমালোচক হিসেবে তাঁর খ্যাতি সর্বজনবিদিত, এমন কি তিনি তাঁর নিজের দলকেও ছেড়ে কথা বলেন না। আজও এই অশীতিপর নেতার উদাত্ত কণ্ঠস্বর, তেজস্বী ভাষণ ও জ্ঞানগর্ভ বক্তব্য শোনার জন্যে প্রতিটি সভায় বিপুল জনসমাবেশ ঘটে। ভদ্রলোক আশি পেরিয়েছেন গত মাসে। ‘কি হয়েছে তাঁর?’ আবার জিজ্ঞেস করল রানা।

‘এই মাত্র খবর এসেছে, স্যার। তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়েছে আততায়ীরা।’

‘কি!’ মাথাটা যেন ঘুরে উঠল রানার। ‘তিনি...?’

মাথা নত করল হার্ডি। ‘লর্ড সেফারস মারা গেছেন, স্যার। সব মিলিয়ে পনেরো জন মারা গেছে। বোমা, স্যার।’

‘কিভাবে? কোথায়?’

‘নির্বাচনী সভা করার জন্যে ওয়েস্ট কানট্রিতে যাচ্ছিলেন। গ্লাসটনবারির একটা ছোট সমাবেশে থামেন তিনি...’

‘ঘটনাটা গ্লাসটনবারিতে ঘটেছে?’ রানা প্রায় চিৎকার করে উঠল।

‘মর্মান্তিক, স্যার, ভারি মর্মান্তিক। জ্বী। একেই বলে হত্যাযজ্ঞ। আহারে...’

এলিভেটরের দিকে ছুটতে শুরু করেছে রানা। গ্লাসটনবারি!– ভাবছে ও। সত্যদর্শীরা তাহলে জন্মস্থানে গেছে! রাগে, ক্ষোভে, দুঃখে নিজের মাথার চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে করল ওর। সত্য সমিতির সদস্যরা জন্মস্থানে যাবে, কথাটা শোনার পর ওর ভাবা উচিত ছিল, কার জন্মস্থানে।

পীর হিকমতের ফাইলে লেখা আছে, তার জন্মস্থান গ্লাসটনবারি। ওখানেই খুন হয়েছেন ইংল্যান্ডের দেশবরেণ্য নেতা লর্ড সেফারস। সত্যদর্শীরা পীর হিকমতের জন্মস্থানে গিয়ে হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে। এলিভেটর থেকে নামার সময় হতভম্ব বোধ করল রানা। রক্ত ঝরবে বাবাদের, কথাটার মানে কি? রক্ত মায়েদেরও ঝরবে, এরই বা কি মানে? এভাবেই ঘুরতে শুরু করবে প্রতিশোধের চাকা?

দশ

'... পুলিসের ভাষ্যমতে, সভার সময় রাত সাড়ে আটটায় নির্ধারিত হলেও, গ্লাসটনবারি চৌরাস্তায় তাঁর বক্তৃতা শোনার জন্যে বহু লোক সমাগম হয়। স্থানীয় ছাত্রদের সহায়তায় পুলিস এখনও উদ্ধার কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। হতাহতদের সংখ্যা আরও বেড়েছে বলে জানা গেছে—এখন পর্যন্ত ত্রিশজন আহত লোককে উদ্ধার করা হয়েছে, নিহত হয়েছেন বিশজন, তাঁদের মধ্যে লর্ড সেফারসও রয়েছেন। মন্ত্রীসভার একটা মীটিং বাতিল করে দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী, লেডি সেফারসের সাথে দেখা করার জন্যে আজ রাতেই তিনি রওনা হবেন বলে আমাদের রিপোর্টার জানিয়েছেন।

'লর্ড সেফারস তাঁর রাজনৈতিক জীবন শুরু করেন উনিশশো ত্রিশ সালে। লেবার পার্টির পদপ্রার্থী হয়ে প্রথমবার তিনি নির্বাচিত হন...।' রেডিওর নব ঘুরিয়ে শর্ট-ওয়েভে দিল রানা, অফিশিয়াল ফ্রিকোয়েন্সিতে সেট করে রাখল। রাস্তায় প্রচুর যানবাহন, তারপরও স্পীড লিমিট মানছে না ও, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব হেডকোয়ার্টারে পৌঁছুতে হবে ওকে।

যা কিছু ঘটছে, প্রতিটির খেই ধরতে গেলে ফিরে যেতে হবে সূচনাপর্বে—নাদিরা রহমানের মৃত্যুর ঘটনায়। তারপর থেকে যা কিছু ঘটেছে, প্রত্যেকটি ঘটনা প্রশ্নবোধক চিহ্ন হয়ে রয়েছে রানার মনে। হেরিফোর্ড থেকে রানাকে নিয়ে লন্ডনের উদ্দেশে রওনা

হলো সার্জেন্ট বিল রেম্যান, ওদের পিছু নিল কয়েকটা গাড়ি। কেউ নিশ্চিতভাবে জানত কোথায় ছিল রানা, যেমন কারও নিশ্চয়ই জানা ছিল যে নিনি খন্দকারকে কিলবার্ন সেফ হাউসে নিয়ে গেছে ও। সেফ হাউস হিসেবে ওটার আর কোন গুরুত্ব নেই।

সার্জেন্ট রেম্যান। ঘুরে ফিরে বারবার নামটা উঠে এল রানার মনে। সে-ই কি? লন্ডনের পথে রওনা হচ্ছে রানা, এই খবরটা কাউকে জানানো তার পক্ষে সম্ভব ছিল, কোন সন্দেহ নেই—কিন্তু তাতে তার লাভ কি? রাস্তায় বিপজ্জনক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়, রানার মত সে-ও তো বিপদের মুখে পড়ে! নিনি খন্দকার আর সেফ হাউসের ব্যাপারটা...ব্যাপারটার সাথে বিল রেম্যানের সংশ্রব আছে কিনা তদন্ত করে দেখতে হবে ওকে। সে কি নিনি খন্দকারের অস্তিত্ব সম্পর্কে জানত? সেফ হাউসটা সম্পর্কে জানত? জানত নিনি ওখানে আছে?

শেষ সম্ভাবনটা বাতিল করে দিতে হয়, ভাবল রানা। নিনি সেফ হাউসে আছে, খুব কম লোকেরই তা জানার কথা। নিনিকে ওখানে নিয়ে যাবার পর টেলিফোনে হেডকোয়ার্টারকে জানিয়েছে রানা। তবে কি হেডকোয়ার্টারে শত্রুপক্ষের কোন পেনিট্রেশন এজেন্ট ওত্ পেতে আছে? তাকে জানতে হবে হেরিফোর্ড থেকে রানার লন্ডনে আসার কথা, জানতে হবে নিনি খন্দকার কোথায় কাজ করছিল, সেখান থেকে কোথায় তাকে নিয়ে যায় রানা। যতদূর জানে ও, এ-সব জানার সুযোগ পেয়েছে মাত্র তিনজন মানুষ—মারভিন লংফেলো, মিচেল আর লিজা।

হার্বার্ট রকসন? ভাবছে রানা। সি.আই.এ-র আবাসিক

প্রতিনিধির কাছে প্রায় কোন ঘটনাই গোপন থাকে না। যদিও, এক্ষেত্রে সন্দেহ আছে ওর।

অন্যান্য সমস্যাগুলো মাথার এককোণে সরিয়ে রাখতে পারল রানা। গ্লাসটনবারিতে একটা বীভৎস হত্যাযজ্ঞ ঘটে গেছে, অন্তত দু'জন লোক জানত ঘটনাটা ঘটতে যাচ্ছে। ডোনার জানাটা অবশ্য একটু অন্যরকম– একজন হিস্টিরিয়াগ্রস্তের প্রলাপ বলা যায়। কার বা কাদের দ্বারা এ-ধরনের একটা মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছে আন্দাজ করা কঠিন নয়। এম.ভি.এফ. সত্যবাবা/পীর হিকমতই দায়ী, সত্য সমিতির সাহায্যে ঘটিয়েছে। কেন, সেটা অন্য প্রসঙ্গ।

হেডকোয়ার্টারে পৌঁছে থমথমে একটা পরিবেশ লক্ষ করল রানা। যেন একটা যুদ্ধাবস্থা মোকাবিলা করতে যাচ্ছে ওরা। নিজের ডেস্কের পিছনে বসে আছেন মারভিন লংফেলো, মুখে ফুটে আছে অনেকগুলো রেখা আর ভাঁজ, কাঁচাপাকা চুল বেশ খানিকটা এলোমেলো, চোখ দুটো ক্লান্ত, সব মিলিয়ে স্তম্ভিত একজন মানুষ। গ্লাসটনবারি থেকে সর্বশেষ খবরের জন্যে অপেক্ষা করছেন তিনি।

'তুমি ঠিক জানো, পুরোপুরি নিশ্চিত, মেয়েটাকে সেফ হাউসে নিয়ে যাবার সময় কারও চোখে পড়োনি?' এবার নিয়ে সম্ভবত দশবার প্রশ্নটা করলেন বি.এস.এস. চীফ।

'পজিটিভ, মি. লংফেলো–কেউ ফলো করেনি। অনুমতি না চেয়ে মেয়েটাকে ওখানে নিয়ে যাওয়ায় আমার দোষ হয়েছে, স্বীকার করি আমি। প্রথমে নিয়ে যাই ওকে, তারপর অনুমতি চাই। আসলে তার নিরাপত্তার ব্যাপারে উদ্বিগ্ন ছিলাম আমি।'

'হুম,' চাপাকণ্ঠে গম্ভীর শব্দ করলেন মারভিন লংফেলো।

'আবার আমি রকসনকে ডেকে পাঠিয়েছি,' অনেকটা স্বগতোক্তির সুরে বললেন তিনি। 'এখন পর্যন্ত যতদূর জানা গেছে, তোমার নিনি খন্দকার ভুয়া কিছু নয়, তার দ্বারা আমাদের কোন ক্ষতি হবার সম্ভাবনা নেই। তবু উদ্বিগ্ন হবার মত আরও অনেক ব্যাপার আছে।'

'আমি বিশেষ করে দুটো বিষয়ে উদ্বিগ্ন।' ডোনা আর আধপাকা ফল সম্পর্কে ভদ্রলোককে এখনও কিছু বলেনি রানা।

রেকর্ডার চালু করে টেপটা চালাবে ও, এই সময় চেম্বারের দ্বিতীয় দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল জন মিচেল। 'টিভির খবরে গ্লাসটনবারির ঘটনাটা দেখানো হবে, স্যার।' কার্পেটের ওপর দিয়ে হেঁটে কামরার এককোণে চলে গেল সে, নিচু তেপয়ে রাখা পোর্টেবল কালার টিভিটা অন করল। নতুন আনা হয়েছে, আগে কখনও দেখেনি রানা। টিভি সেটের উপস্থিতিই পরিস্থিতির গুরুত্ব প্রমাণ করে। টিভি জিনিসটাকে অত্যন্ত সন্দেহের চোখে দেখেন মারভিন লংফেলো। কমপিউটর সম্পর্কেও তাঁর একটা অকারণ ভীতি আছে, তবে সেটা ওরা তাঁকে জোর করে গছাতে পেরেছে।

খবরের সাথে গ্লাসটনবারি হত্যাযজ্ঞের যে ছবি দেখানো হলো, এক কথায় তা বীভৎস। রাস্তার মাঝখানে বিরাট একটা গর্ত তৈরি হয়েছে, যেন হাজার পাউন্ডের বোমা ফেলা হয়েছে কোন বম্বার থেকে। দোমড়ানো মোচড়ানো ইস্পাত, ইস্পাতের যন্ত্রপাতি ইত্যাদি দেখা গেল, এক সময় ওগুলো যানবাহনের অংশবিশেষ ছিল। কয়েকটা বাড়ির সামনের অংশ ধসে পড়েছে, উড়ে গেছে বিস্ফোরণের ধাক্কায়। আশপাশের প্রায় কোন বাড়ি-ঘরেরই জানালায় কাঁচ নেই। খোলা জায়গায় বিস্ফোরকের

বিস্ফোরণ সাধারণ কোন নিয়ম মানে না। বিস্ফোরণের কেন্দ্রবিন্দুর কাছাকাছি দাঁড়িয়ে আছে এমন একজন লোকের কিছুই অবশিষ্ট থাকার কথা নয়–গায়ের কাপড় হারিয়ে বিবস্ত্র হয়ে পড়বে সে, কানে শুনতে পাবে না, দেখতে পাবে না চোখে–তারপরও, টেকনিক্যালি, তার পক্ষে বেঁচে থাকা অসম্ভব নয়। বিস্ফোরণের ধাক্কায় একটা বিল্ডিঙের সমস্ত কাঁচ হয়তো চুরমার হয়ে গেল, বাড়িটার কোন ক্ষতি হলো না, কিন্তু দেখা গেল পাশের বাড়িটা সম্পূর্ণ ধসে পড়েছে।

টিভি ও উদ্ধারকর্মীদের সহায়তায় প্রচুর আলোর ব্যবস্থা করা হয়েছে, সাথে যোগ হয়েছে বিভিন্ন গাড়ির উজ্জ্বল হেডলাইট–আলোকিত রাস্তার ওপর দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে ক্যামেরাম্যান। এখানে সেখানে রক্তের দাগ দেখা গেল, লেডিজ ভ্যানিটি ব্যাগ পড়ে রয়েছে একটা, নর্দমার কিনারায় ঝুলছে একপাটি জুতো। রাস্তার পাশের দোকান-পাটগুলোর কোন অস্তিত্বই নেই।

সংবাদপাঠক গম্ভীর, বিষণ্ন সুরে পরিস্থিতির বর্ণনা দিচ্ছে। শোফারচালিত একটা রোভার নিয়ে রওনা হয়েছিলেন তিনি, পথে তাঁর তিন জায়গায় থেমে সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেয়ার কথা ছিল। সন্ধ্যার দিকে প্রথমবার থামেন তিনি শেপটন ম্যালে–তে, সেখানে কোন ঘটনা ঘটেনি। গ্লাসটনবারির সভা শেষ করে সরাসরি ওয়েলস-এ যাওয়ার কথা ছিল, ওখানেও তাঁর ভাষণ শোনার জন্যে প্রচুর লোকজন ভিড় করে। কিন্তু দুর্ভাগ্য, ওয়েলস-এর মানুষ তাদের প্রিয় নেতাকে আর কোনদিনই দেখতে পাবে না। তাঁর সফরের পরিকল্পনা তৈরি করা হয় মাত্র চারদিন আগে। দেশনেতা লর্ড

সেফারসকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র যারাই করে থাকুক, অমূল্য প্রাণ নিধনের স্থান হিসেবে দেশের সবচেয়ে শান্তিপূর্ণ এলাকাটাকে বেছে নিয়েছে তারা। এই জঘন্য হত্যাকাণ্ডের নিন্দা জানাবার ভাষা আমাদের জানা নেই...

জনপ্রিয় নেতাকে দেখার জন্যে সমাবেশে প্রচুর লোক ভিড় জমায়। গ্লাসটনবারিতে রোভারটা প্রবেশ করা মাত্র স্থানীয় পুলিস একটা গাড়ি নিয়ে পথ দেখায় শোফারকে। চৌরাস্তার দিকে ধীরে ধীরে এগোয় গাড়িগুলো, কারণ রাস্তার সু'ধারে আগে থেকেই অপেক্ষা করছিল জনতা। শৃঙ্খলা রক্ষার জন্যে রাস্তায় টহল পুলিসও ছিল। তবে ঘুণাক্ষরেও কেউ ধারণা করেনি যে লর্ড সেফারস টেরোরিস্টদের টার্গেট হতে পারেন।

চৌরাস্তায় এসে দাঁড়িয়ে পড়ে রোভার, চারদিক থেকে লোকজন ঘিরে ধরে গাড়িটাকে। অবশ্য পুলিস তাদেরকে নিরাপদ দূরত্বে সরিয়ে দিতে সমর্থ হয়। একজন দলীয় কর্মী বৃদ্ধ নেতাকে গাড়ি থেকে নামতে সাহায্য করে। এই সময় শ্লোগানে ফেটে পড়ে জনতা। তাদের প্রিয় নেতা বয়োবৃদ্ধ হলেও, অসুস্থ নন বা নুয়ে পড়েননি। হাতের ছড়ির ওপর ভর দিয়ে শিরদাঁড়া খাড়া করে দাঁড়ান তিনি, মুখে স্মিত হাসি নিয়ে জনতার উদ্দেশে হাত নাড়ান। এই সময় খানিকটা বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় উপস্থিত জনতার মধ্যে। পুলিস কর্ডন ভেদ করে নেতার কাছে চলে আসার চেষ্টা করে কিছু তরুণ। এই তরুণদের মধ্যে থেকেই বেরিয়ে আসে আগুনের গোলাটা। চোখ-ধাঁধানো আলোর সাথে বিস্ফোরণ ঘটে। পুরো দৃশ্যটাই ধরা পড়েছে ক্যামেরায়, টিভি দর্শকদের সবটুকুই দেখতে দেয়া হলো।

‘মাই গড!’ আটক রাখা নিঃশ্বাস ছাড়লেন মারভিন লংফেলো, কয়েক সেকেন্ড শ্বাসকষ্টে ভুগলেন। ‘এ যে অবিশ্বাস্য! কি দেখলাম! কারা এরা, আত্মহত্যা করতে ভয় পায় না? মৃত্যুকে এত তাচ্ছিল্য করে কি করে।’

রানা এবং মিচেল, এ-ধরনের বীভৎস দৃশ্য আগেও ওরা অনেক দেখেছে, তারপরও রীতিমত অসুস্থ বোধ করল।

শেষ হলো টিভির খবর সম্প্রচার। চেম্বারে উপস্থিত তিনজনেরই কাঁপ ধরে গেছে বুকে। ইন্টারকমের শব্দ শুনে প্রায় লাফ দিয়ে উঠলেন বি.এস.এস. চীফও। রিসিভারে কথা বললেন তিনি, শুনলেন, তারপর আবার কথা বললেন, ‘সোজা পাঠিয়ে দাও তাঁকে।’ রিসিভার নামিয়ে রেখে রানা আর মিচেলের দিকে তাকালেন তিনি। ‘উইলবার জেফারসন , এস.বি-র। বলছেন, আমাদের জন্যে জরুরী একটা ইনফরমেশন আছে তাঁর কাছে।’

সংক্রামক ব্যাধির মত, পুলিস সুপারের চেহারাও ঝুলে পড়েছে। ইঙ্গিতে তাঁকে একটা চেয়ার দেখিয়ে দিলেন মারভিন লংফেলো।

‘কেউ কৃতিত্ব দাবি করছে না,’ ক্লান্তস্বরে বললেন পুলিস সুপার। ‘এখন পর্যন্ত আমরা জানি না ঠিক কিভাবে ঘটল ঘটনাটা। পরিচিত কোন টেরোরিস্ট গ্রুপ বা আন্ডারগ্রাউন্ড পার্টি ফোন করবে বলে আশা করছি। আশ্চর্য , এত দেরি করছে কেন ওরা! এমন কি ভুয়া কোন ফোন কলও পাচ্ছি না। সাধারণত ঘটনা ঘটার একঘণ্টার মধ্যে কৃতিত্ব দাবি করা হয়।’ রুমাল দিয়ে মুখের ঘাম মুছলেন ভদ্রলোক। ‘ব্যাপারটা ভারি উদ্বেগজনক। তিক্ত হলেও বলব, এটা প্রথম ও শেষ ঘটনা নয় বলেই আমার

ধারণা ওরা আবার আঘাত করবে।’

‘আমি বলতে পারি কারা দায়ী,’ শান্তসুরে বলল রানা। ‘তবে কিভাবে ঘটেছে জানতে পারলে খুশি হব। বোমাটা কি ছোঁড়া হয়েছিল, পোঁতা ছিল, নাকি রিমোট কন্ট্রোলের সাহায্যে ফাটানো হয়েছে?’

‘কারা দায়ী?’ একযোগে জানতে চাইলেন মারভিন লংফেলো, পুলিস সুপার আর মিচেল।

‘আমার রেকর্ডারটা অন করে দু’জনের কথা শোনাতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু টিভিতে খবর শুরু হওয়ায়...’

রাগ করলেন মারভিন লংফেলো। ‘আগে কেন বলোনি, রানা? বুঝতে পারছ না, ফলো-আপ করতে হলে সমস্ত তথ্য জনা দরকার আমাদের?’

‘সত্যবাবার সমিতিই এরজন্যে দায়ী,’ থমথমে গলায় বলল রানা।

ডোনার রোমহর্ষক, আধিভৌতিক ভবিষ্যদ্বাণী ও হুমকি শোনার সময় একচুল নড়ল না কেউ। তার বক্তব্য আরও পরিষ্কার হলো বিলবার্নে আহত হামলাকারীর কণ্ঠে।

‘লোকটা আরও কিছু জানত...জানে। তাকে আরও জেরা করা দরকার,’ রেকর্ডার অফ করে বলল রানা। ‘ডোনার ব্যাপারটা আলাদা। প্রায় অচেতন অবস্থা থেকে কথা বলছে সে।’ মেয়েটার ব্যাপারে প্রফেসর ওয়েদারবাই কি বলেছেন তাও জানাল রানা, তার শরীরে এখনও ড্রাগের প্রভাব রয়ে গেছে, ড্রাগমুক্ত হবার পর এখন যা কিছু বলছে তার হয়তো কিছুই মনে করতে পারবে

না সে।

'সত্যদর্শীরাই যদি দায়ী হয়ে থাকে, এই মুহূর্তে জরুরী অপারেশন শুরু করা উচিত আমাদের।' মারভিন লংফেলোর চেহারায় ভাবাবেগের কোন অবকাশ নেই, ইস্পাতের তৈরি কঠিন দেখাল মুখটা। 'এই মুহূর্তে লোকবলের অভাব রয়েছে আমাদের, তাই সবাই মিলে একটা ফোর্স গঠন করতে হবে–বি.এস.এস. স্পেশাল ব্রাঞ্চ, লোকাল পুলিস আর অ্যান্টিকোরাপশন।'

'সাথে আমেরিকানরা থাকতে পারে, স্যার,' বলল মিচেল। 'পীর হিকমতকে সি.আই.এ-ও খুঁজছে। ওদেরকে দলে নিলে তদন্তে বোধহয় সুবিধেই হবে।'

'নিতে পারি যদি প্রয়োজন হয়। ঠিক আছে। তোমরা তো জানো, ওদের ব্যাপারে আমার অনুভূতিটা কি...' সবাই ওরা জানে কি বলতে চাচ্ছেন বি.এস.এস. চীফ। হঠাৎ ঝনঝন শব্দে ফোনটা বেজে ওঠায় বাধা পেলেন তিনি। রিসিভার তুলে লিজার কথা শুনলেন, তারপর বললেন, 'ও! ইয়েস, আই সী! ঠিক আছে, দাও তাঁকে ...' নরম সুরে কথা বলছেন। নিঃশব্দে দৃষ্টি বিনিময় করল রানা আর মিচেল।

ছয় কি সাত মিনিট ধরে কথাবার্তা হলো। অপরপ্রান্তের বক্তা সম্পর্কে কারও মনে কোন সন্দেহ থাকল না। 'ইয়েস, প্রাইম মিনিস্টার, ইয়েস...আমার বরং ধারণা, ঠিক পথেই এগোচ্ছি। তবে, ব্যাপারটা অত্যন্ত জটিল। ...অবশ্যই...জ্বী, তা তো বটেই...অ্যাকশন নেয়ার পর রিপোর্ট করব আমি...হ্যাঁ, মাঝরাতে...পৌঁছে যাব আমি, প্রাইম মিনিস্টার।' রিসিভার

নামিয়ে রাখলেন তিনি, সবার দিকে একবার করে তাকালেন চার্চিলসুলভ যুদ্ধংদেহী ভাব নিয়ে, ঘোষণা করলেন, 'ফোন করেছিলেন প্রাইম মিনিস্টার!' জানা কথা অহেতুক নতুন করে বলায় আরেকটু হলে হেসে ফেলছিল মিচেল, তাড়াতাড়ি মুখটা আরেক দিকে ঘুরিয়ে নিল সে। ব্যাপারটা মারভিন লংফেলো লক্ষ করলেন না, কারণ ইতোমধ্যে আবার তিনি কথা বলতে শুরু করেছেন। 'কম্বাইন্ড অপারেশন হবে। যদিও আমরা একটা সাধারণ নির্বাচনের প্রস্তুতির মধ্যে রয়েছি, তবু কোবরা অ্যাসেম্বল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন পি.এম.। মাঝরাতে তাঁর সাথে আমার মীটিং হবে।'

এই সময় কে যেন খুক করে কাশল। কে কাশল দেখার জন্যে তিনজনের দিকেই কটমট করে তাকালেন বি.এস.এস. চীফ। নির্লিপ্ত, নিরীহ চেহারা দেখে অপরাধীকে সনাক্ত করতে পারলেন না।

'আশা করি কোবরা সম্পর্কে সবাই তোমরা জানো?'

বিশেষ একটা কমিটির নাম কোবরা, নামটা গ্রহণ করা হয়েছে চারটে শব্দ থেকে—কেবিনেট অফিস ব্রিফিং রূম। কমিটির চেয়ারম্যান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, অ্যান্টিকোরাপশন, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, মেট্রোপলিটান পুলিস ও স্পেশাল ব্রাঞ্চ থেকে পাঠানো প্রতিনিধিরা সদস্য নির্বাচিত হন। অন্য যে-কোন বিভাগ থেকে সদস্য গ্রহণ করার ক্ষমতা রয়েছে কমিটির।'ব্যাপারটার সাথে মার্কিনীদের স্বার্থ জড়িত,' বলে চলেছেন মারভিন লংফেলো, 'কাজেই আমি প্রস্তাব করছি সি.আই.এ-র হার্বার্ট রকসনকে কো-অপ্ট করা যেতে পারে। তাকে নিলে, তার ওপর চোখ রাখতে

সুবিধে আমাদের। এবার, রানা...'

'ইয়েস, মি. লংফেলো?'

'এবার তুমি তোমার কাজ শুরু করো। তোমাকে নিশ্চয়ই ব্যাখ্যা করে বলার দরকার নেই যে ইংল্যান্ডকে নেতৃত্বহীন করার ষড়যন্ত্র চলছে। একটু নাটকীয় শোনালেও, কথাটা অক্ষরে অক্ষরে সত্যি–ইংল্যান্ডের ইতিহাসে এত বড় বিপদ গত দুশো বছরে দেখা দেয়নি। আমাদের দুর্ব...মানে, অসুবিধের কথাও তোমার অজানা নেই–কাজেই, এই বিপদ থেকে ইংল্যান্ডকে রক্ষা করার দায়িত্ব আমি তোমাদের ওপর দিতে চাই। পরীক্ষিত বন্ধু তুমি...'

খুক করে কেশে রানা বলল, 'এ-সব কথা থাক না, মি.লংফেলো। আসল সমস্যা হলো, এখনও আমরা জানি না ঠিক কিভাবে কি ঘটছে...,' কথা শেষ না করেই পুলিস সুপার উইলবার জেফারসনের দিকে তাকাল ও।

মৃদু কাঁধ ঝাঁকিয়ে পুলিস সুপার বললেন, 'স্পেশাল ব্রাঞ্চের ফরেনসিক এক্সপার্টরা অ্যান্টি-টেরোরিস্ট স্কোয়াডের সাথে কাজ শুরু করেছে। তাদের রিপোর্ট পাওয়ামাত্র জানিয়ে দেয়া হবে। টিভির ছবিটা তো আপনিও দেখেছেন,' সবশেষে বললেন তিনি। 'আমাদের হেডকোয়ার্টারে ছবিটার ওপরও কাজ চলছে।'

মারভিন লংফেলো বললেন, 'রানা, তুমি যদি কাউকে সাথে নিতে চাও...'

'সার্জেন্ট বিল রেম্যান কি ফিরে এসেছে?' জানতে চাইল রানা।

'এসেছে, তবে এখনও আমি তার রিপোর্ট পাইনি।'

'তাকে আমি সাথে রাখতে পারি?' রানা জানে, ঝুঁকি নেয়া হয়ে যাচ্ছে। বলা যায় না, বিল রেম্যান শত্রুপক্ষের লোকও হতে পারে। তবে, ওর সিদ্ধান্তের পক্ষে জোরাল যুক্তিটা হলো, যাকে বিশ্বাস করা যায় না তাকে কাছাকাছি রাখাই সব দিক থেকে ভাল।

'হ্যাঁ, তার রিপোর্ট কি বলে জানার পর।'

'আরেকজনের কথা ভাবছি আমি,' বলল রানা। 'যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি, নিনি খন্দকার। আমার চেয়ে আগে থেকে কেসটার তদন্ত করছে সে।' নিনিও অচেনা একটা চরিত্র, তার পরিচয়-পত্র যা-ই বলুক। তাকেও সম্ভব হলে কাছে রাখা উচিত বলে সিদ্ধান্ত নিল রানা। চোখ রাখো, সতর্ক থাকো। তবে নিজের কাছে স্বীকার না করে উপায় নেই যে ওর মনে তুমুল একটা ঢেউ তুলেছে মেয়েটা।

'তা বটে,' বললেন বি.এস.এস. চীফ, একটু যেন অন্যমনস্ক। 'ঠিক আছে, রানা—তবে, সাবধান থেকো। ইন্টারোগেশন রিপোর্টটা দেখেছি আমি, মেয়েটার পার্সোনাল ফাইলেও চোখ বুলিয়েছি।' ক্ষীণ হাসলেন তিনি। 'ফাইলটা আসলে আমাকে খুশি করার জন্যে দেখতে দেয় রকসন। যোগ্য বটে, তবে মেয়েটার বসের কাছ থেকে ক্লিয়ার‍্যান্স পেতে হবে। সেটা পাওয়া গেলে তাকে তুমি সাথে রাখতে পারো।' আবার তিনি ফোনের দিকে হাত বাড়াচ্ছেন, পুলিস সুপার জানতে চাইলেন এবার তিনি উঠতে পারেন কিনা।

'জরুরী কোন খবর পাওয়ামাত্র যোগাযোগ করব, স্যার।'

ইঙ্গিতে পুলিস সুপারকে বিদায় জানালেন মারভিন লংফেলো,

তারপর কি ভেবে একটা হাত তুলে থামিয়ে দিলেন তাঁকে। 'জানি না বিল রেম্যান আমাদের জন্যে কোন খবর এনেছে কিনা। সত্যদর্শীদের সম্পর্কে রানা যে এভিডেন্স যোগাড় করেছে, তার প্রেক্ষিতে ভাবছি প্যাঙবোর্নে ফরেনসিক এক্সপার্টদের একবার পাঠানো দরকার। আপনি ব্যবস্থা করতে পারবেন, নাকি আপনাদের ডিরেক্টরকে ফোন করব আমি?'

'পারব, স্যার। আমার ওপর ছেড়ে দিন।'

পুলিস সুপারের পিছনে চেম্বারের দরজা বন্ধ হতেই রানার দিকে ফিরলেন বি.এস.এস. চীফ। 'আগে রকসনের সাথে কথা বলি, তারপর সার্জেন্টকে ডাকব, কেমন?' কিন্তু এলিজাবেথ জানাল, মার্কিন দূতাবাস থেকে রওনা হলেও, বি.এস.এস. অফিসে এখনও এসে পৌঁছাননি রকসন। 'তাহলে,' লিজাকে বললেন মারভিন লংফেলো, 'সার্জেন্টকে পাঠিয়ে দাও, অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছে সে।'

সার্জেন্ট বিল রেম্যান নয়, চেম্বারে উদয় হলো যেন একটা ভূত। তার চওড়া কাঁধ ঝুলে পড়েছে, সারামুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি, কাপড়চোপড়ে ধুলোবালি।

'একি! তুমি কি তোমার কমান্ডার অফিসারের কাছেও এই চেহারা নিয়ে রিপোর্ট করো?' স্পষ্টতই বিরক্ত হয়েছেন মারভিন লংফেলো। 'তোমাকে দেখে রীতিমত আতঙ্ক বোধ করছি আমি!'

'আমি দুঃখিত, চীফ। কিন্তু আমি নিরুপায়।'

'কি বলতে চাও বুঝলাম না!' ধমক দিলেন বি.এস.এস. চীফ।

'সত্যি কথা, বসকে আমি বলেছিলাম,' রানাকে ইঙ্গিতে

দেখাল সার্জেন্ট, 'সাহায্য দরকার হলে ডাকবেন আমাকে। কিন্তু আমি কি তখন জানতাম, প্যাঙবোর্নের মত একটা গ্রামে, ঝোপের আড়ালে কাদার মধ্যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা হামাগুড়ি দিয়ে থাকতে হবে? না বিশ্রাম, না খাওয়া, কিছুই জোটেনি কপালে। তারপর এখানে আমাকে ডেকে পাঠানো হলো। এখানেও সেই একই অবস্থা, ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করছি, কখন আমার পালা আসে...'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে।' ভুরু কোঁচকালেন মারভিন লংফেলো। 'বুঝলাম। এখানের কাজ শেষ করে নিজের একটু যত্ন নেবে তুমি, কেমন? এবার বলো, রিপোর্ট করার কিছু আছে তোমার?'

খশখশ করে দাড়ি চুলকাল সার্জেন্ট। 'বেশি কিছু না, স্যার। সামান্যই।'

'বেশ।'

'জমিদারবাড়ির ভেতরটা তন্নতন্ন করে সার্চ করেছি, স্যার। সিঁধ কেটে পথ করি, মানে পাঁচিলের ওপারে যাই, তারপর পিছন দিকের একটা জানালা ভেঙে ভেতরে ঢুকি। জ্বী-না, স্যার, কোথাও হাতের ছাপ রেখে আসিনি। ওখানে যদি কোন এভিডেন্স থেকে থাকে, জ্বী-না, তা-ও নষ্ট করে আসিনি। তবে, হ্যাঁ, একটা কথা বলতে পারি, স্যার—ব্যাটারা জানত, ওদের চলে যেতে হবে। গোটা ব্যাপারটা আগে থেকে প্ল্যান করা ছিল। অন্তত দিন কয়েক আগের প্ল্যান।

'কেন বলছি কথাটা? গোটা জায়গাটা একদম খালি দেখলাম, স্যার। কোথাও কিচ্ছুটি পড়ে নেই। একেবারে ঝকঝক তকতক

করছে। সব একেবারে মুছে নিয়ে চলে গেছে। ওয়েস্টপেপার বাস্কেটে একটুকরো কাগজ পড়ে নেই, ডাস্টবিন সম্পূর্ণ খালি। তাড়াহুড়ো করে গেলে কোথাও না কোথাও একটা শার্ট, বা একটা মোজাও তো পড়ে থাকবে? কিচ্ছু না। দেখে মনে হলো, স্যার, জায়গাটায় কেউ কোন দিন বাস করেনি।'

সার্জেন্ট কথা বলছে, হাসি হাসি ভাবটা লুকোবার জন্যে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে রাখল রানা।

'রানা?'

'ইয়েস, মি. লংফেলো?'

'সার্জেন্টকে তুমি কোন প্রশ্ন করতে চাও?'

'চাকার দাগ? কোন্ দিকে গেছে তার কোন চিহ্ন?'

মাথা ঝাঁকাল বিল রেম্যান। 'জ্বি, বস্। বাড়ির পিছন দিকে চাকার দাগ দেখেছি। কিন্তু গাড়িগুলো, মানে অন্তত চারটে প্রাইভেট কার আর দুটো ছোট ভ্যান, খালি অবস্থায় নিয়ে গেছে ওরা। আরও অনেক গাড়ি ছিল। তা থাকলেও, অত লোক আর মাল-সামানের জায়গা হয়নি। অনেক লোককে হেঁটে যেতে হয়েছে বলে আমার ধারণা।'

'চারটে গাড়ি দুটো ভ্যান খালি ছিল? কিভাবে জানলে তুমি?'

'চাকার দাগ দেখে, বস্। লোড করা থাকলে দাগগুলো আরও গভীর হত।'

'বাড়িটায় কত লোক ছিল বলে তোমার ধারণা?'

'দেড়শোর কম নয়, দুশোও হতে পারে।'

'কিভাবে বুঝলে?'

বত্রিশ পাটি দাঁত বের করে হাসল সার্জেন্ট। 'বিছানা দেখে,

বস্। সিঙ্গেল ও ডবল বেড। তোষক, গদি, চাদর, এ-সব নিয়ে যায়নি। প্রতিটি খাটে তৈরি করা ছিল বিছানা। বললাম না, একেবারে ঝকঝক তক...'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে,' তাড়াতাড়ি বললেন মারভিন লংফেলো।

'বিছানাগুলো তৈরি করা ছিল, কিন্তু বুঝতে পারলাম চাদরগুলো তিন চারদিনের পুরানো, বদলানো হয়নি।'

'বেশ,' বলল রানা। 'আর কি বুঝলে তুমি?'

'হঠাৎ সবাই একসাথে, তা কিন্তু নয়, বস্! দু'দিন ধরে বাড়িটা খালি করে ওরা। সম্ভবত ভারী জিনিসগুলো আগে পাঠিয়ে দেয়া হয়। তারপর তারা দু'জন দু'জন, তিনজন তিনজন করে বেরিয়ে পড়ে। হন্তদন্ত হয়ে নয়, শান্তশিষ্টভাবে। রাস্তা থেকে কিছু লোককে ভ্যানে বা গাড়িতে তুলে নেয়া হয়। বাজারের কাছে একটা চায়ের দোকানে গিয়ে কথা বলি আমি। ঠিক বলিনি, শুনেছি। বুঝলাম, আমার ধারণাই ঠিক। কোথায় যেতে হবে আগে থেকেই জানত ওরা।'

তার বক্তব্যের তাৎপর্য উপলব্ধি করে আড়ষ্ট হয়ে উঠল রানা। বাঘের মত, 'হুম,' করে উঠে গম্ভীর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করলেন বি.এস.এস. চীফ।

আবার টেলিফোন বেজে উঠল, নিচু গলায় নির্দেশ দিলেন মারভিন লংফেলো। তারপর রানার দিকে ফিরলেন তিনি। 'সার্জেন্টকে তুমি নির্দেশ দিতে চাও?'

'তা সম্ভব নয়, মি. লংফেলো, আমি ওকে অনুরোধ করতে পারি।'

'ঠিক আছে...ঠিক আছে, তাড়াতাড়ি সারো। পুলিস সুপার ফিরে এসেছেন,পৌঁছে গেছে রকসনও।'

'রেম্যান,' সার্জেন্টের দিকে ফিরে মৃদু হাসল রানা। 'তুমি কি এখনও আমাদের সাহায্য করতে রাজি আছ?'

'আমাকে যদি দরকার হয়...হ্যাঁ, অবশ্যই, বস্।'

'কাল সকাল ন'টায়।' নিজের ফ্ল্যাটবাড়ির কাছাকাছি একটা জায়গার কথা বলল রানা। 'প্যাঙবোর্নে আরেকবার যাব আমরা।'

'ঠিক সময়ে ঠিক জায়গায় আমাকে দেখতে পাবেন, বস্। আর কিছু, বস্?'

মাথা নাড়ল রানা, একটা হাত তুলে দরজাটা দেখিয়ে দিলেন মারভিন লংফেলো।

'প্রথমে পুলিস সুপার,' বললেন তিনি, সার্জেন্ট বিদায় নেয়ার সাথে সাথে। 'বলছেন, কিভাবে কাজটা করা হয়েছে তা নাকি ওঁরা বুঝতে পেরেছেন। সাথে একটা ভিডিও রয়েছে। স্পেশাল ব্রাঞ্চ থেকে দিয়ে গেছে কেউ, বিল্ডিঙ ছেড়ে কোথাও যাননি তিনি।'

আগের চেয়েও বিধ্বস্ত লাগল উইলবার জেফারসনকে। বগলে একটা ভিডিও রেকর্ডার নিয়ে ঢুকলেন তিনি, পোর্টেবল টিভির সাথে সেট করা হলো। 'টেপটা স্লো করা হয়েছে, আমাদের এক্সপার্টরা ছবিটার গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলো জুম লেন্সের সাহায্য নিয়ে আকারে অনেক বড় করেছে।'

'রেজাল্টস?' তির্যকদৃষ্টিতে আধুনিক ইলেকট্রনিক যন্ত্র দুটোর দিকে একবার তাকালেন বি.এস.এস. চীফ।

'নিজের চোখেই দেখুন, স্যার। প্রথমে, অরিজিনাল টেপটা

দেখুন।' প্লে বাটনে চাপ দিলেন পুলিস সুপার, টিভির পর্দায় ফুটে উঠল আগের সেই দৃশ্য, যা দেখে অসুস্থবোধ করেছিল ওরা। গাড়িগুলো এগিয়ে আসছে, চারদিক থেকে স্লোগান দিচ্ছে হাসিখুশি জনতা, বয়োবৃদ্ধ লর্ড সেফারসকে রোভার থেকে নামতে সাহায্য করা হলো, হাসছেন তিনি, জনতার উদ্দেশ্যে হাত নাড়ছেন, দাঁড়িয়ে আছেন ছড়িতে ভর দিয়ে। তারপর অকস্মাৎ বিশৃঙ্খলা দেখা দিল, পরমুহূর্তে ঘটল বিস্ফোরণ।

'এবার,' পুলিস সুপার বললেন, 'এটা দেখুন।' প্লে বাটনে আবার চাপ দিলেন তিনি। এবারও সেই একই দৃশ্য ফুটল টিভির পর্দায়, তবে মনে হলো জনতার একটা বিশেষ অংশের ওপর ক্যামেরা জুম করা হয়েছে, ভিড় থেকে কিছু তরুণ জোরজার করে সামনে বাড়ছে। তাদের এগিয়ে আসাটা স্লো মোশন-এ দেখতে পাচ্ছে ওরা। ধীরে ধীরে ফ্রেমের ভেতর চলে আসছে রোভারের বনেট।

'সবুজ জ্যাকেট পরা যুবককে লক্ষ করুন!' ফিসফিস করলেন পুলিস সুপার।

সহজেই তাকে দেখতে পেল ওরা। রানা ধারণা করল, যুবকের বয়স হবে ছাব্বিশ কি সাতাশ। অকস্মাৎ, বিস্ময়কর স্লো মোশনের মধ্যে, লাফ দিয়ে সামনে বাড়তে দেখল ওরা যুবকটিকে, চকিতে গাড়ির প্রায় বনেটের ওপর এসে পড়ল সে। আর ঠিক সেই সাথে তার একটা হাত জ্যাকেটের ভেতর ঢুকে গেল, পরমুহূর্তে অজ্ঞাত পরিচয় যুবক পরিণত হলো আগুনের একটা গোলায়—বিস্ফোরিত হলো মাংস, হাড়, রক্ত আর কাপড়।

'মাই গড!' হাঁপিয়ে উঠলেন মারভিন লংফেলো, রিভলভিং

চেয়ারটা ছেড়ে প্রায় দাঁড়িয়ে পড়েছেন। 'মাই গড! ছোকরা নিজেকে ডিটোনেট করল! দ্যাট্স্ টূ হরিবল! টেরিবল!'

'কিন্তু সত্যি যা ঘটেছে তাই দেখছি আমরা, স্যার,' আবার ফিসফিস করে বললেন উইলবার জেফারসন। 'আসলেও গ্লাসটনবারিতে একটা হিউম্যান বম্ব বিস্ফোরিত হয়েছে, লর্ড সেফারসের গায়ের কাছে।'

দৃশ্যটা আবার দেখালেন তিনি। এবার প্রায় বমি এসে গেল রানার।

'ধরো ওদের, রানা!' পরস্পরের সাথে চেপে বসা দু'সারি দাঁতের মাঝখান দিয়ে কথা বললেন মারভিন লংফেলো। 'ইংল্যান্ডের মাটি থেকে নিশ্চিহ্ন করো ওদের। ধরো, মারো, খতম করে দাও! এ-ধরনের নির্দেশ দেয়ার কথা পরে হয়তো আমি স্বীকার করব না, কিন্তু এই মুহূর্তে শুনতে তুমি ভুল করছ না। গো আউট অ্যান্ড ফাইন্ড দ্য ডেভিলস। কিল দেম!'

এগারো

ঘড়ির অ্যালার্ম ঘুম ভাঙিয়ে দিল রানার। চোখ মেলল, সচেতন প্রতিটি ইন্দ্রিয় উপলব্ধি করল শুরু হয়েছে নতুন একটা দিন। কিচেন থেকে শব্দ ভেসে আসছে, এরইমধ্যে নাস্তা তৈরিতে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে রাঙার মা। চোখ বুজে আরও ক'মিনিট বিছানায় পড়ে থাকতে ইচ্ছে করল ওর, আলসেমির সাথে কালকের ঘটনাগুলো

বিশ্লেষণ করাও হবে। কিন্তু না, সাড়ে সাতটা বাজে। চিন্তা-ভাবনার কাজটা সেরে নেয়া যাবে দিনটার জন্যে নিজেকে তৈরি করার সময়।

বাড়িতে থাকুক বা বাইরে, কিংবা দেশে বা বিদেশে, রানার সকালের রুটিন প্রায় কখনোই বদলায় না। কিছুক্ষণের মধ্যে ঘেমে নেয়ে উঠল ও। ভি-সিটাপ করল বিশবার, পঞ্চাশবার ওঠ-বস, স্টেশনারি রানিং করল বিশ মিনিট, হাত দিয়ে পায়ের আঙুল ছুঁলো পঞ্চাশবার, বুকডন দুই কিস্তিতে পঞ্চাশ-পঞ্চাশ একশোবার। গায়ের ঘাম শুকোবার পর বাথরুমে ঢুকল ও। প্রথমে গরম, তারপর হিম শীতল পানিতে শাওয়ার সারল।

রানার মন-মেজাজ বুঝতে পারে রাঙার মা, টের পেয়ে গেল আজ কথা বলার দিন নয়। রানার প্রিয় খাবার দিয়ে সাজানো ব্রেকফাস্ট ট্রেটা ডাইনিং রুমে রেখে কিচেনে ফিরে গেল সে। তার প্রতি সামান্যই মনোযোগ দিল রানা। কিচেনে ফিরে গিয়ে গজ গজ করছে বুড়ি, 'রাত করে বাড়ি ফিরবে, সকাল বেলা হাঁড়ি করে রাখবে মুখটাকে—কেন, বিয়ে করে বউ আনলেই তো পারে! দেশে ছিলাম ভাল ছিলাম, এই হতচ্ছাড়া ভাব দেখতে হত না আমাকে। তা না, খেস্টানদের মাঝখানে এনে ফেলা হয়েছে। এই বুড়ো হাড়ে আমি আর পারি না, বাপু...'

শুনেও না শোনার ভান করল রানা। তবে সত্যি, কাল অনেক রাতে বাড়ি ফিরেছে ও। ভিডিওতে লর্ড সেফারসের হত্যাকাণ্ড চাক্ষুষ করার পর সত্যদর্শী আর তাদের গুরুকে ধরার জন্যে কিভাবে তদন্ত শুরু করবে তার একটা ছক তৈরি করে ও। তারপর মারভিন লংফেলোর সাথে হার্বার্ট রকসনের মীটিং হলো,

উপস্থিত থাকতে হলো ওকেও। পরিস্থিতিটাকে নাজুকই বলতে হবে, কারণ রকসনকে ব্যক্তিগতভাবে ওর অপছন্দ নয়, কিন্তু মি. লংফেলো তাকে দু'চোখে দেখতে পারেন না।

যুক্তরাষ্ট্রের ইন্টারনাল রেভিনিউ-এর এজেন্ট নিনি খন্দকার অনুমতি ছাড়াই ইংল্যান্ডে তৎপরতা চালাচ্ছে, অভিযোগটা আনুষ্ঠানিকভাবে জানাবার সময় অত্যন্ত কড়া ভাষা ব্যবহার করলেন মারভিন লংফেলো। শান্ত, হাসিখুশি থাকার চেষ্টা করল হার্বার্ট রকসন। সবিনয়ে জানাল সে, নিনি খন্দকারকে চেনে বটে, কিন্তু তার দায়িত্ব বা তৎপরতা সম্পর্কে কিছুই তার জানা নেই। বি.এস.এস. সত্যি যদি কোন অভিযোগ করতে চায়, সরাসরি অ্যামব্যাসাডরকে চিঠি পাঠাতে হবে। 'চিঠি, পাল্টা চিঠি, এইসব করতে করতে প্রচুর সময় বেরিয়ে যাবে। আমার মনে হয়, তার দরকার নেই...।'

'দরকার নেই মনে করব আমিও, যদি আপনারা ক্ষমা প্রার্থনা করেন, এবং এই কেসটায় আমাদেরকে সাহায্য করার প্রস্তাব দেন!' দাবিনামা পেশ করলেন মারভিন লংফেলো।

'আমরা তো, স্যার,' সহাস্যে বলল রকসন, 'আপনাকে সাহায্য করার জন্যে একপায়ে খাড়া।'

এত বিনয়, বি. এস. এস. চীফের বোধহয় সহ্য হলো না, গা-জ্বালা ভাবটা দূর করার জন্যে কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থাকলেন তিনি। তারপর অন্য প্রসঙ্গে চলে গেলেন, বললেন, 'টেরোরিস্টদের জঘন্য ব্যাপারটা...'

'লর্ড সেফারস, স্যার? সত্যি আমরা আতঙ্ক বোধ করছি...'

‘কোবরা কমিটিতে আপনাকে কো-অপ্ট করা হতে পারে,’ মারভিন লংফেলো বাধা দিয়ে বললেন। ‘তার আগে ওয়াশিংটন থেকে অনুমতি নিতে হবে আপনার। নিনি খন্দকারের জড়িয়ে পড়ার ব্যাপারটাও আপনাকে সামলাতে হবে।’

অনুরোধ করায় ফোন সহ নিরিবিলি একটা কামরা ছেড়ে দেয়া হলো হার্বার্ট রকসনকে। কোবরা কমিটিতে থাকার জন্যে ওয়াশিংটনের অনুমতি চাইল সে। তার অনুরোধে ইন্টারন্যাল রেভিনিউ কর্তৃপক্ষ রাজি হলো, বি.এস.এস-কে নিনি খন্দকার সাহায্য করতে পারলে খুশিই হবে তারা।

রকসন ফোনে কথা বলছে, এই ফাঁকে রানাকে মারভিন লংফেলো জানালেন, ‘কোবরা কমিটির ধরন-ধারণ আমার জানা আছে, সারারাত ধরে মীটিং চলবে—সিদ্ধান্ত হবে কাল বিকেল নাগাদ। আশা করি ইতিমধ্যে তুমি অনেকদূর এগিয়ে যাবে, রানা।’

আমারও তো বিশ্রাম আর ঘুম দরকার, নাকি?—মনে মনে ভাবল রানা, মুখে কিছু না বলে শুধু মাথা ঝাঁকাল। চেম্বারে ফিরে এসে এক গাল হাসল রকসন, বলল, ‘দুটো টেলেক্স আসছে—কোবরায় থাকার অনুমতি দেয়া হয়েছে আমাকে, নিনিও বি.এস.এস-কে সাহায্য করার অনুমতি পেয়েছে।’ রানার দিকে ফিরল সে। ‘তুমি ভাগ্যবান হে। মেয়েটা দারুণ।’ মারভিন লংফেলোকে আড়াল করে রানার উদ্দেশ্যে একটা চোখ টিপল সে।

‘মি. রকসন উপস্থিত থাকায় কিছু আসে যায় না,’ মারভিন লংফেলো বললেন, ‘রানা, তোমার অপারেশনের কোড নেম ঠিক

করা হয়েছে—ফারমার। তোমার কাছ থেকে ভাল ফসল চাই আমি। এবার দু'জনেই বিদায় হও তোমরা, ওপরতলায় গিয়ে নিনি খন্দকারের সাথে কথা বলো।' রকসনের দিকে তাকালেন তিনি। 'সরাসরি এখানে ফিরে আসবেন, দেখতে হবে আপনাকে কোবরায় কো-অপ্ট করতে সদস্যরা রাজি হয় কিনা।'

চেয়ার ছেড়ে দাঁড়াল রানা, দেখাদেখি রকসনও, তার মুখে ক্ষীণ ব্যঙ্গাত্মক হাসি লেগে রয়েছে।

নিনি খন্দকারের সাথে হার্বার্ট রকসনের সংক্ষিপ্ত আলোচনা হলো। ওদের সাথে পাঁচ মিনিট থাকার পর, 'সিকিউরিটির ব্যাপারে এক লোকের সাথে আলাপ করে আসি,' বলে ওদেরকে একা ছেড়ে দিল রানা।

কথা যা বলার একা নিনিই বলল, রানার সাথে রওনা হবার জন্যে তৈরি হতে বেশি সময় নিল না সে। কাজেই আবার ওদের কাছে ফিরে এসে রকসনকে বলল রানা, 'তুমি বরং ছ'তলায় ফিরে যাও। নিনি, তোমাকে আমি তোমার ফ্ল্যাটে পৌঁছে দেব। আমি চাই, প্রচুর বিশ্রাম নিয়ে সমস্ত ক্লান্তি কাটিয়ে ওঠো তুমি। আমাদের লোক তোমার ফ্ল্যাটের ওপর নজর রাখছে। কথা দিচ্ছি, রাতে তোমার ধারে কাছে কেউ ঘেঁষতে পারবে না।'

'সত্যি?' কৃত্রিম হতাশায় চেহারা স্লান করে তুলল নিনি। 'আমি ভেবেছিলাম তুমি অন্তত একবার কাছাকাছি হওয়ার চেষ্টা করবে, রানা!'

স্মিত হাসল রানা, নিনির বাম কাঁধে একটা হাত রাখল। 'ধন্যবাদ, আমার ওপর বিশ্বাস রাখো জেনে খুশি হলাম। কিন্তু, আমারও বিশ্রাম দরকার।'

গাড়ি নিয়ে অভিজাত কেনসিংটন এলাকায় পৌঁছুল ওরা। অ্যাপার্টমেন্ট ভবনটা নতুন তৈরি হয়েছে, চারটে কামরা নিয়ে নিনির ফ্ল্যাট। তার সাথে ওপরে উঠে এল রানা, গোটা বিল্ডিঙে বা ফ্ল্যাটের ভেতর কেউ লুকিয়ে আছে কিনা দেখাটাই অন্যতম উদ্দেশ্য।

সন্দেহজনক কিছু চোখে পড়ল না। ভাড়া করা ফ্ল্যাট হলেও, আসবাব-পত্র ও অভ্যন্তরীণ সাজসজ্জায় নিজস্ব রুচি ও ব্যক্তিত্বের ছাপ রেখেছে নিনি। ড্রইংরুমে ছোট একটা বার দেখল রানা, রাশিয়ার ভোদকা থেকে শুরু করে সব রকম পানীয়ই আছে। কে. জি. বি-র প্রতীক চিহ্ন ছাপা একটা পোস্টার রয়েছে একদিকের দেয়ালে, নিচে লেখা, 'সাবধান! নৌ, বিমান বা স্থলবাহিনী সম্পর্কে কোন আলাপ নয়।' শোবার ঘরে দুটো প্রিন্ট পেল, একটা হকনি-র পানামা হ্যাট, অপরটা ফ্রিঙ্ক-এর স্পিনিং ম্যান সেভেন।

এক এক করে সবগুলো কামরাই পরীক্ষা করল রানা। অজুহাত আগেই তৈরি করে রেখেছে, নিনির অবর্তমানে কেউ ভেতরে ঢুকেছিল কিনা জানা দরকার। সত্যি বটে ঠিক তাই জানার চেষ্টা করছে রানা, তবে এ-কথাও বিশ্বাস করে ও যে বেঁচে থাকার ধরন দেখে একটা মেয়েকে বোঝা যায়। দেখেশুনে মনে হলো, নিনি খন্দকার পরিচ্ছন্ন, সুরুচিসম্পন্ন, বিদূষী, শিল্পীমনা, এবং অত্যন্ত চৌকশ আন্ডারকভার এজেন্ট। ড্রেসিং টেবিলের ওপর প্রচুর বিদেশী সেন্ট রয়েছে। ওয়ার্ডরোবটাও খুলে পরীক্ষা করল রানা। কাপড়চোপড়ের মধ্যে শাড়ি কম, বেশিরভাগই স্কার্ট, শার্ট আর জিনস্। টেলিফোনটা বেডরুমে। রানা লক্ষ করল, সাদা স্টিকার দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছে নম্বরটা।

‘কোথাও কোন গলদ নেই,’ অবশেষে বলল রানা।

‘চা? কফি? নাকি অন্য কিছু?’ নিনির চোখে আমন্ত্রণ, কিংবা রানার দেখার ভুলও হতে পারে।

মাথা নাড়ল রানা। ‘কাল অনেক ছুটোছুটি আছে, নিনি। দু’জনেরই ফ্রেশ থাকা দরকার।’

‘ছুটোছুটি... কেন, কোথায় যাচ্ছি আমরা, রানা?’ আরও কাছে সরে এল নিনি, আবার যাতে তার চুলের গন্ধ পায় রানা। এখন আর বারুদের ঝাঁঝ নেই, তার বদলে রানার নাকে ঢুকল হালকা একটা মিষ্টি সুগন্ধ। নিজেকেই প্রশ্ন করল রানা, কখন, কোত্থেকে পেল?

‘প্রথমে যাব সত্যদর্শীরা যেখানে ছিল, প্যাঙবোর্নে,’ বলল রানা। ‘সাথে লোক থাকবে, আমাদের টীমের একজন সদস্য সে।’

‘আচ্ছা।’ আওয়াজটা শুনে মনে হলো নিনির গলায় কি যেন আটকে গেছে। দৃঢ়চেতা, আত্মবিশ্বাসী মেয়েটা হঠাৎ করে রানার কাঁধে মুখ গুঁজে দিল, ফুঁপিয়ে কাঁদছে, শক্ত করে জড়িয়ে ধরল রানাকে।

প্রায় নিজের অজান্তেই, তাকে কাছে ধরে রাখল রানা। তারপর, অনিচ্ছাসত্ত্বেও, অনুভব করল মেয়েটার বুক আর উরুর চাপে সাড়া দিচ্ছে ওর শরীর। তার পিঠে সান্ত্বনাসূচক মৃদু চাপড় দিল ও, কানের কাছে মুখ নামিয়ে ফিসফিস করে বলল, ‘শান্ত হও, কি হয়েছে? কি ব্যাপার, নিনি?’

ফোঁপাতে ফোঁপাতে রানাকে কলাপাতা রঙের সোফার দিকে টেনে নিয়ে এল নিনি। এখনও রানাকে ধরে ঝুলে আছে সে,

ফোঁপানোর আওয়াজের সাথে কেঁপে কেঁপে উঠছে তার শরীর। নিজেকে বোকা বোকা লাগছে রানার, শান্ত করার জন্যে বিড়বিড় করছে।

এক সময়, দশ কি পনেরো মিনিট পর, রানাকে ছেড়ে দিল নিনি, জোরাল একটা ঢোক গিলল, চোখ মোছার জন্যে ব্যবহার করল হাতের উল্টোপিঠটা। 'দুঃখিত, রানা,' নিচু গলায় বলল সে। হয় মেয়েটা অত্যন্ত ঘাবড়ে গেছে, নয়তো পাকা অভিনেত্রী, ভাবল রানা। ফর্সা মুখ লাল হয়ে উঠেছে নিনির, চোখের চারপাশে ধুয়ে গেছে মেকআপ, গালে লেগে রয়েছে পানির দাগ, ভিজে গেছে নাকের ফুটো, ফুটো জোড়ার কিনারা চোখ জোড়ার মতই লালচে হয়ে উঠেছে। সোফা ছেড়ে দাঁড়াল সে, বেডরূমে ঢুকে বেরিয়ে এল একটু পরই, হাতে টিস্যু। নিজেকে পরিষ্কার করে গুছিয়ে নেয়ার সময় কোন কথা বলল না।

বিব্রতবোধ করছে রানা। কাঁদুনে মেয়ে একদম পছন্দ করে না ও, কিন্তু এখনকার ঘটনাটা কেন যেন অন্য রকম। আরেকবার কারণটা জানতে চাইল ও।

'কারণ...কি কারণ, তুমি বোঝো না, রানা?' আবার ফুঁপিয়ে উঠল নিনি, তার চোখে রাগ, ঠোঁট দুটো ফোলা ফোলা। 'কি আবার কারণ হতে পারে!'

'জানি, দিনটা খুব খারাপ গেছে তোমার। সত্যি আমি...'

ব্যঙ্গাত্মক, ছোট্ট হাসির শব্দটা বদলে গেল ধীরে ধীরে, ফোঁপানোর আওয়াজে পরিণত হলো। 'জানি, জানি, সবাই তাই বলবে—আমি ট্রেনিং পাওয়া আন্ডারকভার এজেন্ট। কিন্তু...কাকে

বোঝাব? কে বুঝবে? হপ্তার পর হপ্তা, মাসের পর মাস সাধনা করে সত্যদর্শীদের কাছাকাছি পৌঁচেছি আমি। তারপর? তারপর কি হলো? একইদিনে দু'দু'বার সত্যিকারের ভায়োলেন্সের মধ্যে পড়তে হলো আমাকে। জীবনে এই প্রথম মৃত্যুকে আমি কাছ থেকে দেখলাম! একবার নয়, দু'বার। একই দিনে। বুঝতে পারছ না, এর প্রতিক্রিয়া কি হতে পারে...?'

'আমি তোমাকে উপদেশ দিতে চাই না, নিনি, তবে এ-সব...'

'এ-সব মেনে নিয়েই বাঁচতে শিখতে হবে আমাকে! জানি, ট্রেনিঙের সময় এ-কথাই বলা হয়। কিন্তু আমার দ্বারা তা সম্ভব কিনা সত্যি আমি তা জানি না।' বড় করে শ্বাস টানল নিনি, শরীরটা কেঁপে উঠল। 'ওই লোকটাকে... রবার্টসনকে...রানা, তাকে কি আমি খুন করেছি?'

'তোমার ট্রেনিং খুব ভাল হয়েছে, নিনি। হয় তার বাঁচার কথা, নয়তো তোমার—কিংবা আমার। তোমার মত ট্রেনিং পাওয়া একটা মেয়ের যা করা উচিত তাই করেছ।'

'সে কি আমার হাতে মারা গেছে?' নিনির চোখে এখন পানি নেই, পানির জায়গায় অন্য কি যেন রয়েছে ওখানে। রাগ? অনুশোচনা? জিনিসটা আগেও দেখেছে রানা, তবে শুধু পুরুষদের চোখে।

'হ্যাঁ,' দৃঢ়তার সাথে বলল রানা, গলার স্বরে খানিকটা নিষ্ঠুরতারও প্রকাশ ঘটল। 'লোকটাকে তুমি খুন করেছ, নিনি। ওই পরিস্থিতিতে সবাই তাই করত—অন্তত আমাদের পেশায়। লোকটাকে খুন করেছ, কিন্তু বেঁচে থাকতে হলে কথাটা তোমাকে

মন থেকে মুছে ফেলতে হবে, তা না হলে পরের বার তোমার লাশটাই মর্গে যাবে। সময় থাকতে মন থেকে সব মুছে ফেলো।'

'কিভাবে?' প্রায় চিৎকার করে জানতে চাইল নিনি।

এক সেকেন্ড চিন্তা করল রানা, তারপর বলল, 'রবার্টসনের ভূতটাকে আদেশ করো—ভাগ ব্যাটা! মন থেকে কেটে পড়।'

রানার দিকে নিশ্চলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল নিনি। টিক-টিক করে বয়ে চলল সেকেন্ডগুলো। এক সময় আরও একটা দীর্ঘশ্বাস টানল সে। 'ধন্যবাদ, রানা। তোমার কথাই ঠিক। আসলে...প্রথমবার তো! ভয়ানক নাড়া দিয়ে গেছে আমাকে।'

'ভেবে দেখো, তুমি যদি সামলে উঠতে না পারো, আমার কি করার থাকে? হয় তোমাকে আমাদের অফিসে আটকে রাখতে হবে, তা না হলে ফেরত পাঠাতে হবে ওয়াশিংটনে। এ-ধরনের অনিশ্চয়তা বা ভাবাবেগ আমার পোষাবে না, যদি একসাথে কাজ করতে হয় আমাদের।'

ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকাল নিনি। 'আমি সামলে নেব। ধন্যবাদ, রানা।' সামনে ঝুঁকে রানাকে চুমো খেলো সে, অপ্রত্যাশিতভাবে সরাসরি ঠোঁটে।

মৃদু ধাক্কা দিয়ে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল রানা। চিন্তাটা আবার উদয় হলো ওর মনে, মেয়েটার সাথে গভীরভাবে জড়িয়ে পড়া যেন খুব বেশি সহজ। তবে, তার সম্পর্কে পুরোপুরি নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত ব্যাপারটা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। 'নিনি, আমি দুঃখিত, কিন্তু এবার আমাকে যেতে হয়।'

মাথা ঝাঁকাল নিনি, চোখভরা বিষণ্নতা নিয়ে হাসল। 'বুঝতে পারছ তো, নিজেকে আমি সামলে নিয়েছি। রানা, আমি যদি

তোমাকে বিব্রত করে থাকি, নিজগুণে ক্ষমা করে দিয়ো।'

কথা না বলে বিশ্বাস, আস্থা আর আন্তরিকতা ভরা দৃষ্টি উপহার দিল রানা।

'থাকো, রানা। প্লীজ,' বিড়বিড় করে অনুরোধ জানাল নিনি।

'কাজ, নিনি, কাজ। তোমারও বিশ্রাম দরকার। ঠিক আছে, একসাথে আরও খানিকটা পথ হাঁটি আমরা, তারপর নাহয় দেখা যাবে, কেমন?'

ঠোঁট ফুলিয়ে অভিমান প্রকাশ করতে গিয়ে মুখ তুলে হাসল নিনি।

সকালে কখন তাকে তুলে নেবে ইত্যাদি জানিয়ে বিদায় নেয়ার জন্যে তৈরি হলো রানা। সার্জেন্ট বিল রেম্যানকেও সময় দিয়েছে ও, নিনিকে সময় দিল দশ মিনিট পর। বিদায়ের মুহূর্তে ঝোঁকের মাথায় মেয়েটাকে আলিঙ্গন করল একবার, সান্ত্বনাসূচক চাপ দিল, আলতোভাবে ঠোঁট ছোঁয়াল দুই গালে। 'বিদায়, নিনি। গুডনাইট। মন খারাপ করে ঘুমটা নষ্ট কোরো না।'

'ঠিক আছে।'

'তাহলে কাল সকালে, কেমন?'

'নতুন একটা দিনে, গত চব্বিশ ঘণ্টার তুলনায় প্যাঙবোর্ন ভ্রমণকে মনে হবে পিকনিক। আবার দেখা হবে, রানা।'

অ্যাপার্টমেন্ট ভবন থেকে বেরিয়ে এসে রাস্তার শেষ মাথায় নিঃসঙ্গ ভ্যানটাকে দেখতে পেল রানা, পাশের বাড়ির গেটের কাছ থেকে ফুটপাথে এসে দাঁড়াল টহল পুলিসদের একজন। নিরাপত্তারক্ষীরা নিজেদের দায়িত্ব ঠিকমতই পালন করছে।

গাড়ি ছেড়ে দিয়ে রানা ভাবল, বিল রেম্যানকে যতটুকু বিশ্বাস

করে ও, ঠিক ততটুকুই বিশ্বাস করে নিনি খন্দকারকে, পরিমাণটা অবশ্যই বেশি নয়। তারপর একটা কথা ভেবে মনে মনে হাসল ও—কাল সকালে প্যাঙবোর্ন যাওয়াটা ওদের প্রথম কাজ নয়। অন্য একটা প্ল্যান আছে ওর। এখন শুধু দেখতে হবে, প্যাঙবোর্ন যাওয়া সংক্রান্ত খবরটা ফাঁস হয়ে যায় কিনা।

আজ সকালে, নিজের নিরাপদ বাড়ির ভেতর দিনটার জন্যে নিজেকে তৈরি করার সময়, কিছু প্রশ্ন আর ক্লু নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে রানা। বলা যায় না, দেখতে পায়নি এমন কিছু ধরা পড়তে পারে মনের চোখে।

প্রথম থেকে যা যা ঘটেছে, স্মরণ করার চেষ্টা করল রানা।

নদীতে ডুবে মারা গেল নাদিরা রহমান। তার নোটবুকে একা শুধু ওর টেলিফোন নম্বর পাওয়া গেল। এমন হতে পারে, নম্বরটা উদ্দেশ্যমূলকভাবে রাখা হয়েছিল নোটবুকে? সন্দেহ নেই, মারভিন লংফেলো ওকে লন্ডনে ফেরার নির্দেশ দেয়ার সাথে সাথে ওর ওপর নজর রাখতে শুরু করে কেউ। নাদিরা রহমানের মৃত্যু একটা সেট-আপ কিনা। ওকে ফাঁদে ফেলার কোন ষড়যন্ত্র? মেয়েটা হয়তো জানতই না তার নোটবুকে ওর ফোন নম্বর ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে।

এমন কি হতে পারে, ড্রাগের সাহায্যে আচ্ছন্ন করার পর, তার মাথায় উদ্ভট কিছু ধারণা ঢুকিয়ে দেয়ার পর, ডোনা চেস্টারফিল্ডকে ছেড়ে দেয়া হয়? কিন্তু কেন? এম. ভি. এফ. সত্যবাবার মত একজন লোক, কিংবা পীর হিকমতের মত একজন লোক, রানা বা বি. এস. এস-কে কেন টোপ গেলাতে চাইবে? ব্যাপারটা কি স্রেফ তার অহমিকা বা দম্ভ হতে পারে?

'দেখো, তোমাকে আমি আগেই যথেষ্ট সাবধান করে দিয়েছিলাম। এখন বোঝো, কি করার ক্ষমতা রাখি আমি! খুন করতে পারি, আভাসে তোমাদের জানাইনি? ধাঁধার অর্থ বুঝতে না পারলে আমার কি দোষ! মন দিয়ে শোনো, কান খোলা রাখো–আরও ধাঁধা দেয়া হবে।'

পীর হিকমতের পক্ষে এ-ধরনের চিন্তা করা সম্ভব। তার ডোশিয়েই বলছে, অত্যন্ত জটিল মন মানসিকতার অধিকারী একজন ভিলেন।

একটা ব্যাপারে সন্দেহ নেই, কেউ জানত লন্ডনে ডেকে পাঠানো হবে ওকে। যেমন জানতে পারে, অ্যাভং কার্ট অফিসে যাবে ও।

তারপর, নিনিকে যে কিলবার্ন সেফ হাউসে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, তা-ও জেনে ফেলে ওরা। ওখানে ওরা হামলা করল কেন–নিনিকে খুন করার জন্যে, নাকি তাকে উদ্ধার করার জন্যে? ইতোমধ্যে পরিষ্কার হয়ে গেছে, জীবনের কোন মূল্য দেয় না ওরা। নাকি আত্মবলিদান?

কে বেঈমানী করছে, কার দ্বারা সম্ভব? সার্জেন্ট রেম্যান? নাকি নিনি খন্দকার? অথবা অন্য কেউ? হার্বার্ট নয়তো? কোথাও পৌঁছুতে পারছে না রানা, ঘুরপাক খাচ্ছে চিন্তাগুলো।

কিলবার্ন সেফ হাউসের পরিস্থিতি নিয়ে ভাবতে শুরু করল রানা। হফম্যান দৃঢ়তার সাথে জানিয়েছে, ওখান থেকে কাউকে ফোন করার উপায় নিনি খন্দকারের ছিল না। সত্যি কি তাই? বেচারা মাইকেল একবার বাইরে বেরিয়েছিল, হফম্যান সে-সময়টায় ব্যস্ত ছিল অপারেশন রুমে। রানা জানে, মনিটরে ধরা না

পড়েও ওই বাড়ির এক্সটারনাল লাইন ব্যবহার করা সম্ভব। সম্ভব রিসিভার থেকে আড়িপাতার সরঞ্জাম খুঁজে পাওয়া। হফম্যান সম্পর্কেও একটা প্রশ্ন জাগল ওর মনে। নিজেকে স্মরণ করিয়ে দিল, তার ফাইলে একবার চোখ বুলাতে হবে। একটা কথা নিশ্চয় করে বলা যায়। কাউকেই বিশ্বাস করা যাবে না। এমন কি নিজেকেও নয়। কাল রাতের কথা মনে পড়ে গেল ওর। ওর আলিঙ্গনের ভেতর নিনির কোমল স্পর্শ, মিষ্টি হালকা নারীসুলভ গন্ধ। লোভনীয়, আকর্ষণীয় নারী। সতর্ক না হতে পারলে পরিস্থিতি যে নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাবে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

ব্রেকফাস্ট শেষ করে বেডরূমে ফিরে এল রানা, কোমরে জড়ানো তোয়ালেটা ছেড়ে দিয়ে একজোড়া স্ল্যাকস, শার্ট আর হালকা জ্যাকেট পরল, তার আগে নাইনএমএম এএসপি-র হারনেসের স্ট্র্যাপ আটকে নিয়েছে বগলের নিচে। ওর সাথে ছোট্ট, টেলিস্কোপিক কনসিলেবল অপারেশনস ব্যাটনটাও রয়েছে–ভোঁতা একটা অস্ত্র, নাগালের মধ্যে চলে এলে একজন লোককে থামাতে ওটার কোন জুড়ি নেই, দক্ষ হাতে পড়লে ওটা দিয়ে খুন করাও সম্ভব।

গ্যারেজ থেকে গাড়ি বের করার আগে একটা ফোন করল রানা। তিন মিনিট কথা বলল জন মিচেলের সাথে। হ্যাঁ, কিলবার্নে আহত টেরোরিস্ট লোকটাকে সারের ক্লিনিকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, কাল বিকেলে যেখানে প্রফেসর ওয়েদারবাই আর ডোনা চেস্টারফিল্ডের সাথে দেখা হয়েছে ওর। ওকে আশ্বাস দিয়ে জানাল মিচেল, প্যাঙবোর্ন জমিদারবাড়ির ওপর নজর রাখছে

একটা টীম। কোড ওয়ার্ড বলতে না পারলে ধারেকাছে কাউকে ঘেঁষতে দেবে না তারা। রানার ধারণাই ঠিক, জানাল মিচেল, মি. লংফেলো এখনও কোবরা কমিটির মীটিং থেকে ফেরেননি। 'বাজি ধরে বলতে পারি, আজ বিকেলের আগে কোন সিদ্ধান্তেই একমত হতে পারবেন না ওঁরা।' রিসিভার রাখার আগে দু'জনেই একচোট হাসল।

রাঙার মাকে ডেকে বলল রানা, আজ কখন ফিরতে পারবে বলা যাচ্ছে না। জবাবে নাতিদীর্ঘ একটা বক্তৃতা শুনতে হলো–শুধু কাজ আর ব্যায়াম করলেই কি চলবে, শরীরের জন্যে বিশ্রাম আর ঘুম দরকার নেই? গজগজ করতে করতে চোখের আড়ালে সরে গেল বুড়ি, কিন্তু তার কথাগুলো অস্পষ্টভাবে হলেও ঠিকই শুনতে পেল রানা। 'কি জানি বাপু, কি দিনকাল পড়ল! জামার কলারে ওগুলো কিসের দাগ আল্লা মাবুদ বলতে পারবে। কেন, দেশে কি ভদ্রঘরের মেয়ে ছিল না?'

ঠিক জায়গা থেকে, ঠিক সময়মতই সার্জেন্ট বিল রেম্যানকে গাড়িতে তুলে নিল রানা। ওর পাশে, প্যাসেঞ্জার সীটে উঠে বসল সার্জেন্ট। দাড়ি কামিয়েছে লোকটা, পকেটবহুল গাঢ় রঙের সুতী কাপড়ের স্যুট পরেছে। 'এবার আমাকে আপনার পছন্দ হবে তো, বস্?' দাঁত বের করে হাসল সে।

'তোমাকে অন্যরকম লাগছে।' হাসিটা ফিরিয়ে দিল রানা, তার পরিচ্ছন্ন চেহারার দিকে ভাল করে তাকাল, খুঁজে পাবার চেষ্টা করল লোকটার দৃষ্টিতে বিদ্রূপের কোন ভাব আছে কিনা।

কেনসিংটনের মোড়ে আজও ভ্যানটাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল রানা। বিল্ডিঙের নিচে নেমে এসে ফুটপাথের কিনারায়

দাঁড়িয়েছে নিনি, কালো ডেনিমে ঝলমলে লাগছে ফর্সা চেহারা। উজ্জ্বল হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে আছে মুখ। তার চোখে এমন একটা দৃষ্টি দেখল রানা, এরকম দৃষ্টি নিয়ে শুধু একজন প্রেমিকাই তার প্রেমিকের দিকে তাকায়। নিনি আর রেম্যানকে পরস্পরের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়া হলো, বাঁক নিয়ে যানবাহনের স্রোতে মিশে গেল রানার বেন্টলি।

'প্রথম চাষী। কাঠঠোকরা প্রথম চাষীকে ডাকছি। প্রথম চাষী সাড়া দাও।'

অলসভঙ্গিতে হ্যান্ডমাইকের দিকে হাত বাড়াল রানা। 'কাঠঠোকরা, প্রথম চাষী বলছি। তোমার ডাক শুনতে পাচ্ছি আমি। জবাব দাও, কাঠঠোকরা।'

'কাঠঠোকরা প্রথম চাষীকে বলছি। ভূমিকম্প আবার বলছি, ভূমিকম্প।'

'প্রথম চাষী। বুঝতে পেরেছি, কাঠঠোকরা। আমি যোগাযোগ করব। রজার। ওভার অ্যান্ড আউট।'

কিছুই বুঝতে বাকি থাকল না রানার। আগেই একমত হওয়া গেছে, আজ সকালে যদি প্যাঙবোর্নের জমিদারবাড়িতে কোন ঘটনা ঘটে সেটাকে ভূমিকম্প বলে অভিহিত করা হবে। আজ খুব ভোর থেকে জায়গাটার ওপর নজর রাখছে একটা টীম। মেসেজটার মানে হলো, কিছু একটা ঘটেছে ওখানে। আর ওখানে কিছু ঘটার মানে হলো, রানার প্রস্তাবিত ট্যুর সম্পর্কে কেউ একজন সত্য সমিতি বা তাদের লীডার পীর হিকমতকে আগেই জানিয়ে দিয়েছে।

এখনও লন্ডন শহরে রয়েছে ওরা, ব্যাক সীট থেকে নিনি

বলল, 'আমরা ঠিক রাস্তা ধরে যাচ্ছি তো, রানা?' রানা ভাবল, নিনির গলায় কি শুধুই বিস্ময়?

'আপনি যেন বলেছিলেন, বস্,' বলল সার্জেন্ট বিল রেম্যানকে, 'আমরা প্যাঙবোর্নে যাব। সেখানে যেতে হলে তো উল্টো দিকের পথ ধরতে হবে।' রানা অনুভব করল, সার্জেন্টের বলার সুরে কি যেন একটা আছে। অসন্তোষ?

'আরে, তাই তো! রানা?' নিনি কি আঁৎকে উঠল?

'প্ল্যান সামান্য একটু বদলেছে।' নাক বরাবর সামনে তাকিয়ে আছে রানা। 'না, শেষ পর্যন্ত প্যাঙবোর্নে যাওয়া হচ্ছে না। কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, তার আগে বরং দু'একজনকে ইন্টারোগেট করা দরকার।'

'ইন্টারোগেট?' গলা সামান্য চড়ল নিনির।

'কাকে ইন্টারোগেট করা হবে, বস্?' সার্জেন্টের ভঙ্গিটা প্রায় মারমুখোই বলা যায়।

'কিলবার্নে যে লোকটা আহত হলো,' বলল রানা। 'নিনিকে ছিনিয়ে নেয়ার চেষ্টা করেছিল যে।' রানার স্বরে কোন উত্থান-পতন নেই।

চুপ হয়ে গেল সবাই।

বেন্টলির ভেতর নতুন, অপ্রীতিকর একটা উত্তেজনা দেখা দিল।

বারো

‘একান্ত নিজস্ব কোন ব্যাপার, বস্, নাকি আমরাও ধাঁধার আসরে অংশগ্রহণ করতে পারি?’ সতর্ক সঙ্কেত আসার পর পনেরো মিনিট পেরিয়ে গেছে, এই সময় প্রশ্নটা করল সার্জেন্ট।

‘দুঃখিত।’ শরীরের পেশী শিথিল করে দিয়ে শান্তভাবে গাড়ি চালাচ্ছে রানা, চোখ দুটো রাস্তার ওপর, তবে জানে সার্জেন্ট বা নিনির ভেতর থেকে কিছু একটা উথলে উঠতে পারে। ‘দুঃখিত, ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করা উচিত ছিল আমার। তোমরা জানো, গোপন একটা অপারেশনে রয়েছি আমরা। তোমাদের দু’জনকেই আমার সাথে কাজ করার অনুমতি দেয়া হয়েছে। অপারেশনের নাম ঠিক হয়েছে, চাষী। প্রথম চাষী, মানে আমি।’

‘ভূমিকম্প?’ পিছনের সীট থেকে জানতে চাইল নিনি। রিয়ারভিউ মিররে তাকে দেখতে পেল রানা, সামনের দিকে ঝুঁকে পড়েছে।

‘আমরা সত্য সমিতির আস্তানায় যাচ্ছিলাম, তাই না? ভাল কথা, সার্জেন্ট রেম্যান আগেও ওখানে গেছে, জায়গাটা সম্পর্কে তার কাছ থেকে পরে জেনে নিয়ো। আমাকে নতুন নির্দেশ দেয়া হয় একেবারে শেষ মুহূর্তে। ভূমিকম্প শুনে যাই মনে হোক, ব্যাপারটা ভয়ঙ্কর কিছু নয়। এর মানে হলো, ক্লিনিকে ওরা আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে। ক্লিনিকটা সারের কাছাকাছি।’

‘ওই ক্লিনিকেই তাহলে আছে গুলি খাওয়া লোকটা?’

সকৌতুকে একটু হাসল রানা। ‘বলো, নিজের হাতে গুলি খাওয়া। আমাদের পেশায় সবারই মনে রাখা দরকার, শটগানের গুলি খুব কাছ থেকে করতে নেই, বিশেষ করে তুমি যখন ইস্পাতের পাত দিয়ে মোড়া দরজাকে টার্গেট করছ।’

‘দেখে কিন্তু মনে হয়নি ওটা ইস্পাত দিয়ে মোড়া,’ খেদ প্রকাশ পেল নিনির কণ্ঠে, যেন লোকটার জন্যে দুঃখ অনুভব করছে সে।

‘ওটা যদি সাধারণ কাঠের তৈরি হত, তুমি খুশি হতে?’ সত্যিসত্যি হাসি দেখা গেল রানার ঠোঁটে। নিনি আর সার্জেন্ট, দু’জনকেই উত্তেজনায় টান টান বলে মনে হলো ওর। সন্দেহ হলো, দু’জনেই শত্রুপক্ষের গুপ্তচর কিনা। সত্য সমিতির একজোড়া সদস্য? স্লিপার বা পেনিট্রেশন এজেন্ট, জায়গামত রোপণ করা হয়েছে কর্তৃপক্ষ ধর্মীয় সংগঠনটার বিরুদ্ধে কি ধরনের তৎপরতা চালায় দেখার জন্যে? নাকি গোটা ব্যাপারটাই ওর কল্পনা?

ফাঁকা রাস্তায় উঠে এসে গাড়ির স্পীড বাড়িয়ে দিয়েছে রানা। তারপরও সারেতে পৌঁছুতে একঘণ্টার ওপর লেগে গেল। ক্লিনিকের গেটে নিরাপত্তা রক্ষীরা দাঁড় করাল গাড়িটাকে। গার্ডহাউসের বাইরে দু’জন লোককে দেখল রানা, জানে আরও দু’জন লোক বাড়ির ভেতর বসে আছে, ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরা অপারেট করছে তারা, নজর রাখছে ক্লিনিকের ভেতর ও বাইরে।

উঠানের একধারে একটা অ্যাম্বুলেন্স আর তিন চারটে গাড়ি পার্ক করা রয়েছে। প্রফেসর ওয়েদারবাইয়ের গাড়িটা চিনতে

পারল ও, একটা ল্যানসিয়া।

আজ সকালে সূর্যটা নিশ্প্রভ, লক্ষ করল রানা। আকাশে কিছু কিছু মেঘ আছে।

প্রাক্তন নৌবাহিনীর একজন সদস্য বসে আছে রিসেপশনে, ভাল করেই চেনে তাকে রানা। কোন অনুরোধ করার আগেই ফোনের রিসিভার তুলে শান্ত সুরে কথা বলল সে, কাকে যেন জানাল, প্রফেসর ওয়েদারবাইয়ের সাথে দেখা করার জন্যে দলটা এইমাত্র পৌঁচেছে। গদিমোড়া চেয়ারে চুপচাপ বসে অপেক্ষা করছে ওরা। রানা অনুভব করল, ওর সঙ্গী দু'জন ঠিক যেন স্বস্তি বোধ করছে না। বিরক্তিকর দাঁত ব্যথার মত আগের সন্দেহটা আবার ফিরে এল ওর মনে।

দশ মিনিট পর রিসেপশনে ঢুকলেন প্রফেসর ওয়েদারবাই, উজ্জ্বল হাসিখুশি চেহারা, এক করা হাতের নড়াচড়া দেখে মনে হলো বেসিনের পানিতে ধুয়ে নিচ্ছেন। তাঁর আসতে দেরি হওয়ায় আজেবাজে অনেক কথা ভাবছিল রানা, মনের এমন অবস্থা হয়েছে যে ছায়া দেখলেও লাফিয়ে উঠবে–প্রফেসরের হাত কচলানো দেখে একজন সাইকিয়াট্রিস্টের ব্যাখ্যাটা মনে পড়ে গেল ওর। অবচেতন মনে অপরাধবোধ থাকলে মানুষ এভাবে হাত কচলায়। লক্ষণটাকে কী সিনড্রোম যেন বলা হয়, ঠিক স্মরণ করতে পারল না।

সঙ্গীদের 'সহকর্মী' বলে পরিচয় করিয়ে দিল ও, নাম বলল না। পালা করে দু'জনের সাথেই করমর্দন করলেন প্রফেসর। নিনিকে 'মাই ডিয়ার' বলে সম্বোধন করলেন, ক্ষমা চেয়ে নিলেন অপেক্ষা করিয়ে রাখার জন্য। 'ডোনাকে নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম।'

রানার দিকে ফিরে ক্ষীণ হাসলেন তিনি।

'তার অবস্থা এখন ভালর দিকে?'

'যতটুকু আশা করেছিলাম তার চেয়ে ভাল। জ্ঞান ফিরে পেয়ে বেশ কয়েক ঘণ্টা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ছিল আজ ভোরে। তার পর আবার খানিকটা আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে। ফিরে গেছে স্বপ্নের জগতে। আরও দিন কয়েক সময় লাগবে, বুঝলে। ভালই হয়েছে, তার বাবা ফিরে গেছেন শহরে। তবে তার দুই কাকা আর ভাই দেখতে এসেছে।

ঝট্ করে মুখ তুলল রানা। 'তার কোন ভাই আছে বলে তো শুনিনি।'

'আরে, কি বলো! নেই মানে, অবশ্যই আছে। শুধু তোমাকে বলছি, ভাইটাকে আমি পছন্দ করতে পারিনি। বড় বেশি কথা বলে। আ লিটল মেডিকেল নলেজ ইজ আ ডেঞ্জারাস থিং, রানা। অক্সফোর্ডে ডাক্তারী পড়ত ছোকরা। রাজনীতি না কি যেন করত, বের করে দেয়া হয়।'

'আমাদের কাজ শেষ হলে তার সাথে আলাপ করা যেতে পারে।' নিনি আর সার্জেন্টকে নিয়ে উদ্বেগ তো রয়েছেই রানার মনে, লর্ড চেস্টারফিল্ডের ছেলেকে নিয়ে কেন যেন মনটা খুঁতখুঁত করতে শুরু করল। কি যেন একটা মনে পড়ার কথা, কিন্তু স্মরণে আসছে না। কোথাও কিছু শুনেছে, বা পড়েছে? হাতের গুরুত্বপূর্ণ কাজটার স্বার্থে মাথা থেকে চিন্তাটা সরিয়ে দেয়ার চেষ্টা করল ও। 'আর আমাদের রোগী?' প্রফেসরকে জিজ্ঞেস করল ও।

মৃদু হাসলেন প্রফেসর–সবজান্তার, গোপন হাসি। 'তার কেবিনে যেতে পারো তোমরা। ধরে নিচ্ছি, এ-ধরনের ব্যাপারে

তোমার সহকর্মীদের অভিজ্ঞতা আছে?'

'কি জানি।' নিনি আর সার্জেন্টের দিকে ফিরল রানা। 'ড্রাগ অ্যাসিসটেড ইন্টারোগেশন সম্পর্কে কোন কোর্স করেছ তোমরা?'

'হ্যাঁ,' জানাল নিনি।

'না,' বলল বিল রেম্যান।

'ওয়েল।' ওদের দিকে ফিরে হাসলেন প্রফেসর। 'আগের চেয়ে পরিস্থিতি অনেক উন্নত হয়েছে। আগে সাসপেক্টকে সোডিয়াম পেনটাথোল ইঞ্জেকশন দিয়ে প্রশ্ন করা হত। এখন অনেক বেশি ফ্যাসিলিটি পাচ্ছি আমরা। যেমন, হিপনোটিকস্। ওটার সাহায্যে মন আর অবচেতন মন, দুটোকেই সাফ করে নিতে পারি। ব্রেনটাও হালকা করা যায়।' রানার দিকে ফিরলেন তিনি। 'যা করার তুমিই করবে, ধরে নিতে পারি?'

'চিকিৎসার দিকটা যদি আপনি দেখেন।'

'আগেই দেখা হয়েছে, ডিয়ার বয়, আগেই দেখা হয়েছে। লোকটা অঘোরে ঘুমাচ্ছে। জনপ্রিয় থ্রিলার উপন্যাসে যেমন দেখা যায়, শুধু একটা ট্রুথ সেরাম দিলেই কেল্লা ফতে–তোমার সব কথার জবাব পেয়ে যাবে।' নিনির দিক থেকে সার্জেন্টের দিকে, তারপর আবার নিনির দিকে তাকালেন প্রফেসর। 'আসলে জিনিসটা ট্রুথ সেরাম নয়। তবে সঠিক প্রশ্ন করা গেলে রোগীর অনেক গভীরে পৌঁছুনো সম্ভব।' চকচকে, উজ্জ্বল চোখে রানার দিকে তাকালেন এবার। 'আশা করি সঠিক প্রশ্ন করার জন্যে তৈরি হয়ে এসেছ তুমি, রানা?'

'আশা করি। লোকটাকে এখানে আনার পর তার কাছ থেকে নতুন কোন তথ্য আদায় করা গেছে? নাম বা এ-ধরনের কিছু?'

‘দু’একবার চেষ্টা করা হয়েছে, কিন্তু বোবা আর কালার ভূমিকা নেয় সে। মি. লংফেলো একমত হয়ে জানালেন, এটাই একমাত্র উপায়। কাল রাতে তিনি যখন বললেন তোমাকে পাঠানো হবে, ভারি খুশি হলাম।’

ওঝা ব্যাটা সব ভেস্তে দিল, রাগের সাথে ভাবল রানা। নিনি আর সার্জেন্টের দিকে তাকালই না ও, যদিও জানে মন্তব্যটা ওদের শুনতে না পারার কোন কারণ নেই। তারমানে এখন ওরা জানে, অপরাধী হোক বা না হোক, অকস্মাৎ প্ল্যান বদল সম্পর্কে মিথ্যে কথা বলেছে রানা। যদি অপরাধী হয়, আরও সতর্ক হয়ে যাবে। অপরাধী না হলে, রেগে উঠবে।

কয়েক সেকেন্ডের নিস্তব্ধতা ভেঙে নিনি বলল, ‘দেরি করে লাভ কি?’

করিডর ধরে এগোল ওরা, ইস্পাতের একটা দরজাকে পাশ কাটাল–রানা জানে, নিরাপত্তা রক্ষীরা ওই কামরার ভেতর ক্যামেরা অপারেট করছে। এই মুহূর্তে সম্ভবত একটা টিভি মনিটরে করিডরে যারা রয়েছে তাদের সবার ছবি ফুটে উঠেছে। বাড়ির গেট থেকে ভেতরের প্রতিটি ইঞ্চির ওপর নজর রাখছে ওরা।

হাঁটতে হাঁটতে কথা বলছেন প্রফেসর। লন্ডন ক্লিনিক থেকে রোগীকে সারেতে আনার সময় কড়া সিকিউরিটির ব্যবস্থা করা হয়েছিল, দেখে মুগ্ধ হয়েছেন তিনি। গোটা ব্যাপারটাকে তিনি ‘স্মুথ অ্যাজ আ কিডনি ট্র্যান্সপ্ল্যান্ট’ বলে বর্ণনা করলেন। ঘরোয়া আলোচনায় মেডিকেল টার্মস ব্যবহার করেন তিনি, তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা তা জানেন। শোনা যায়, তিনি নাকি একবার এক ডিনার

পার্টিতে পরিবেশিত পুডিং দেখে বলেছিলেন, জিনিসটা গল ব্লাডারের মত দেখতে। কেলেঙ্কারির চূড়ান্ত হয়েছিল সেদিন, অনেকেই অভুক্ত অবস্থায় পার্টি ছেড়ে চলে যান।

রোগীর মুখ থেকে বেশিরভাগ ব্যান্ডেজ সরিয়ে ফেলা হয়েছে, তার বদলে জায়গা করে নিয়েছে ছোট আকারের কিছু অ্যাঢেসিভ ড্রেসিং। জানালাগুলোয় ভারী পর্দা ঝুলছে, ঘাড় বাঁকা দুটো টেবিল ল্যাম্প থেকে আলো পড়েছে বিছানার ওপর। লোকটার মাথার কাছে ফেলা একটা চেয়ারের দিকে ইঙ্গিত করলেন প্রফেসর। 'দেখে যেন মনে হয় দাড়ি কামাতে গিয়ে নিজেকে ক্ষতবিক্ষত করেছে, তাই না?' চেয়ারটায় বসছে রানা, ওর দিকে তাকিয়ে নিঃশব্দে হাসলেন তিনি।

'সন্দেহ হচ্ছে, আমাদের যেন কোন প্রয়োজনীয়তা নেই—অবাঞ্ছিত,' নিনির গলায় খেদ প্রকাশ পেল। যে-কোন মুহূর্তে রেগে উঠতে পারে।

'বস্, আমাদের ওপর আপনার বিশ্বাস থাকা দরকার, আপনি কি বলেন?' ভারী গলায় জানতে চাইল সার্জেন্ট।

'অবশ্যই,' তাড়াতাড়ি বলল রানা। 'না, না—তোমরা অবাঞ্ছিত হতে যাবে কেন! নিনি, এ-ধরনের সাবজেক্ট আগেও তুমি দেখেছ। সার্জেন্টকে ব্রিফ করা হয়েছে। ইন্টারেস্টিং কিছু লক্ষ করলে, আমাকে জানাবে তোমরা। প্রশ্নের ধারা ঠিক করতে সুবিধে হবে আমার।' শরীরটা ঘোরাল ও, যাতে নিনির দিকে তাকানো যায়। 'এই লোকটা...একে আগে কখনও দেখেছ তুমি?'

বিছানার আরও কাছে সরে এল নিনি, রানার কাঁধের ওপর দিয়ে লোকটার দিকে তাকাল। দীর্ঘ কয়েক সেকেন্ড সময় নেয়ার

পর জবাব দিল সে, 'পরিচিত। অ্যাভং কার্ট অফিসে চাকরির জন্যে আমার ইন্টারভিউ নেয় তিনজন লোক। ইন্টারভিউয়ের সময় কোন মহিলাকে আমি দেখিনি। আশপাশে আরও লোকজন ছিল। তাদেরকে আমি একজিকিউটিভ বলে ধরে নিই। তাদের সাথে এই লোকটাও ছিল।'

'ওর সম্পর্কে আর কিছু জানো তুমি?'

'লোকটা ছোটখাট হলেও, ওকে আমার খুব স্মার্ট বলে মনে হয়েছিল। সুন্দরভাবে কাটা একটা দামী স্যুট পরে ছিল...ও, হ্যাঁ, মনে পড়ছে, আরও একবার ওকে আমি দেখেছি।'

'কোথায়?'

'অফিস থেকে বেরিয়ে ট্যাক্সি নিচ্ছি, দেখলাম একটা গাড়িতে চড়ছে লোকটা।'

'ওটার ওপর নজর রেখেছিলে? গাড়িটার ওপর? তোমাকে ফলো করেছিল?'

'হতে পারে। ঠিক জানি না। রাস্তায় তখন প্রচুর গাড়ি। অন্তত দেখতে পাইনি।'

নিনি কি সত্যি কথা বলছে? তার সব কথা কি সত্যি? ভাবছে রানা। নাকি নিজের কভার পোক্ত করার চেষ্টা করছে সে? 'সব কাজেই ওস্তাদ, বোঝা যাচ্ছে,' প্রায় স্বগতোক্তির সুরে বলল ও। তারপর প্রফেসরের দিকে তাকাল। 'আসুন, শুরু করা যাক। আপনি রেডি তো, প্রফেসর?'

ইঞ্জেকশনে কাজ হতে দু'মিনিট সময় লাগল। নিঃসাড় শুয়ে থাকল রোগী, বালিশে মাথাটা স্থির। হঠাৎ শুধু চোখের পাতা দুটো কেঁপে উঠল একবার। তারপর, এক মিনিটের মধ্যে, সম্পূর্ণ জেগে

উঠল সে–চোখ দুটো পুরোপুরি খোলা, তাকিয়ে আছে সিলিঙের দিকে, পলক পড়ছে না। বড় করে শ্বাস টেনে শুরু করল রানা, 'সত্যদর্শীরা দুনিয়াটা দখল করে নেবে।'

'বাবাদের রক্ত সন্তানদের ওপর ঝরবে। রক্ত ঝরবে মায়েদেরও,' স্বাভাবিক, শান্ত কণ্ঠস্বর। কথার সুরে সামান্য একটু হিন্দী টান আছে।

'তোমার নাম বলো,' জিজ্ঞেস করল রানা।

'আমার ইহজগতের নাম, নাকি পরলোকের?'

সামান্য শিরশির করে উঠল রানার গা। 'দুটোই। প্রথমে তোমার ইহজগতের নাম।'

'আমার নাম খলিল। ইব্রাহিম খলিল।'

'কোত্থেকে এসেছ তুমি?'

'মাটির দুনিয়ায় আমার দেশ হলো গুজরাট। তবে, স্বভাবতই, আমি আমার দেশকে বিসর্জন দিয়েছি। আমি একজন স্বর্গযাত্রী, স্বর্গযাত্রীদের এ-দুনিয়ায় নির্দিষ্ট কোন সীমান্ত নেই। সত্যদর্শী বা স্বর্গযাত্রীরা গোটা পৃথিবীর নাগরিক, গোটা পৃথিবীই একদিন আমাদের পদানত হবে।'

'আর তোমার পরলোকের নাম?'

'পরলোকের নাম বা মৃত্যু নাম–জোসেফ গুজরাল।'

'তোমার এই নামের কোন বিশেষ তাৎপর্য আছে কি?' কোন সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না দেখে তাড়াতাড়ি আবার বলল রানা, 'স্বর্গযাত্রীরা দুনিয়াটা দখল করে নেবে।'

'তা যদি তুমি জানো, তা হলে তুমি এ-ও জানো যে মৃত্যুনাম যে-কোন একটা বেছে নেয়া হয়। মৃত্যুই হলো একমাত্র

তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা।'

'কেন, মৃত্যু একমাত্র তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা হবে কেন?'

'শুধু মৃত্যুর কোন তাৎপর্য নেই। একজন সত্যদর্শীর মৃত্যুকে বরণ করার ধরনটাই তাৎপর্যপূর্ণ। অসম সাহসের সাথে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করছে সে। কেন সে এভাবে আলিঙ্গন করছে মৃত্যুকে, এর তাৎপর্য কি? কারণটা হলো, এভাবেই, খাঁটি একজন বিশ্বাসী হিসেবে, নিজের স্বর্গে যাবার পথ তৈরি করছে সে। স্বর্গযাত্রীরা দুনিয়াটা জয় করতে পারবে, যদি আমরা—যারা আগে যাব বলে ঠিক হয়েছে—দুনিয়ার বর্তমান পরিস্থিতি বদলে দিতে পারি।'

'ভাল,' বলল রানা, যেন মনোযোগী একজন ছাত্রের ভূমিকা নিয়েছে ও, যার শেখার আগ্রহ প্রবল। 'স্বর্গযাত্রীরা কিভাবে বদলে দেবে দুনিয়াটা?'

'আহুতি দিয়ে। দুনিয়ার বুকে সর্বশেষ বিপ্লবটি ঘটিয়ে, যে-বিপ্লব সফল হলে দুনিয়ার আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা মানুষের তৈরি রাজনৈতিক জোয়াল থেকে মুক্তি পাবে। পৃথিবী ও সভ্যতার সত্যিকার বিকাশ ঘটতে পারে, শুধু যদি যারা শাসক—ভাল বা মন্দ—তাদেরকে খতম ও নিশ্চিহ্ন করা যায়। আর যখন সবাই প্রকৃত সত্যকে বুকের ভেতর স্থান দেবে।'

'শুধু তখন?'

'শুধু তখন, যখন ত্রুটিপূর্ণ আদর্শ, মানুষ যাকে রাজনীতি বলে, ঘৃণা ভরে হিংস্রতার সাথে পরিত্যাগ করা হবে। রাজনীতি নামক বিষবাষ্প থেকে মানুষকে সরিয়ে আনতে পারলেই বিকাশ ঘটবে সভ্যতার, সত্যিকার অর্থে মুক্তি পাবে মানুষ। আজ পর্যন্ত যত বিপ্লব হয়েছে, সবই ছিল ভুয়া—যেমন ভুয়া ছিল সমস্ত দর্শন

আর নীতিকথা। স্বর্গযাত্রীরা দুনিয়াটাও দখল করে নেবে, তবে শুধু যদি প্রতিশোধের চাকা পুরো বৃত্তটা ঘুরে আসতে পারে।'

'সত্যদর্শীরা সবাই কি এর জন্যে তৈরি হয়েছে?'

'যাদেরকে বাছাই করা হয়েছে, যারা চাক্ষুষ করেছে সত্যকে, তারা সম্পূর্ণ তৈরি হয়ে অপেক্ষা করছে।'

'কোথায় অপেক্ষা করছে তারা?'

'যার যার নির্ধারিত জায়গায়। অবিবাহিত আর সন্তানহীনরা সহজ কাজগুলো করবে। বিবাহিতরা, যাদের সন্তান আছে, তারা করবে বিরাট সব কাজ। প্রত্যেককেই নির্দেশ দেয়া হয়েছে, বা হবে। এই মুহূর্তে তারা সবাই দুনিয়ার চারটে কোণে ছড়িয়ে রয়েছে। তারা সন্তানের জন্ম দেবে, তারপর মারা যাবে, যাতে তাদের সন্তানরা সন্তান জন্ম দিয়ে মৃত্যুকে বরণ করতে পারে–যতক্ষণ না প্রতিশোধের চাকা পুরো বৃত্তটা ঘুরে আসে।'

'তোমাকে কি নির্দেশ দেয়া হয়েছে?'

'আমি আমার প্রথম কাজটা করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছি।'

'জোসেফ গুজরাল, তোমার প্রথম কাজটা কি ছিল?'

'কালনাগিনীটাকে শেষ করা। ওই কালনাগিনী আমাদের ভগবানকে খুন করার জন্যে ইংল্যান্ডে এসেছে। আমাদের পিতা সত্যবাবার শত্রুর কোন অভাব নেই। প্রতিটি শত্রুকে খুঁজে খুঁজে বের করে খতম করা হবে। প্রথমবার আমি ব্যর্থ হয়েছি। পরেরবার হব না।'

'তোমাকে নতুন কোন কাজ দেয়া হয়েছে, জোসেফ?'

'ব্যর্থ হয়েছি, কাজেই নতুন কাজ অবশ্যই দেয়া হবে আমাকে।'

'যেভাবে দেয়া হয়?'

'হ্যাঁ।'

'সরাসরি ভগবান সত্যবাবার তরফ থেকে?'

'সরাসরি, সরাসরি তাঁর মুখ থেকে। কিংবা যে তাঁর মৃত্যুনাম বলতে পারবে, তার কাছ থেকে।'

'তাঁর মৃত্যু নামটা কি, জোসেফ?'

সাবজেক্ট চুপ করে থাকল, কোন সাড়া নেই।

'ভগবান সত্যবাবার মৃত্যুনাম? জোসেফ?' আবার জিজ্ঞেস করল রানা।

'শুধু আমাদের পিতা সত্যবাবার মৃত্যুনাম বদলায়, সূর্য আর চাঁদের সাথে। এ এমন একটা শব্দ, যা আমরা উচ্চারণ করতে পারি না–নিজেদের মধ্যেও না।'

'কিন্তু কোন সন্দেহ নেই, তিনি আসবেন?'

বিছানায় পড়ে থাকা লোকটা হাসল, যেন পরম বিশ্বাসে। 'অবশ্যই আসবেন তিনি, কিংবা তাঁর কাছে আমাকে নিয়ে যাবার জন্যে কাউকে পাঠাবেন। আমি জানি, খুব তাড়াতাড়ি আসবেন তিনি।'

'তিনি এসে তোমাকে একটা কাজ দেবেন, যে কাজটা তোমাকে মৃত্যুর দিকে নিয়ে যেতে পারে?'

'আমি এক সন্তানের পিতা হয়েছি, কাজেই বাছাই করা স্বর্গযাত্রীদের একজন ধরা হয় আমাকে। আমাকে একটা মৃত্যুকাজ বরাদ্দ করা হবে, সেটা শেষ করতে পারলে আমার জীবন হবে অনন্ত সুখের, আমার স্ত্রী ও সন্তান হবে দুর্লভ সম্মানের অধিকারী। হ্যাঁ, পরবর্তী কাজটা হবে মৃত্যুকাজ।'

'তুমি কি জানো, এই মুহূর্তে আমাদের পিতা সত্যবাবা কোথায় আছেন?'

'আমরা সত্যদর্শীরা চারদিকে ছড়িয়ে আছি, কিন্তু আমাদের পিতা জানেন, যেমন ভগবান বা যীশু জানেন, কখন কোথায় রয়েছে তাঁর শিষ্য বা উম্মতরা। যে-কোন মুহূর্তে আমাদের যে কোন সত্যদর্শীর কাছে পৌঁছুতে পারেন তিনি, বরাদ্দ করতে পারেন নতুন কাজ।' রানার ঘাড়ের পিছনে চুলগুলো খাড়া হয়ে গেল, আতঙ্কের একটা অনুভূতি চামড়ার তলায় কিলবিল করছে। বুঝতে যদি ভুল না হয়, যতটুকু আশঙ্কা করেছিল পরিস্থিতিটা তারচেয়ে অনেক বেশি ভয়ঙ্কর।

'ঠিক আছে, আমাদের পিতা সত্যবাবা তোমার কাছে আসুন, বা তাঁর মৃত্যুনাম বলতে পারে এমন কাউকে তোমার কাছে পাঠান। ব্যাপারটা মঙ্গল বয়ে আনবে, জোসেফ। এখন তুমি বিশ্রাম নাও।' প্রফেসরকে সঙ্কেত দিল ও, সাবজেক্টকে ঘুম পাড়াবার জন্যে যা করার করতে পারেন তিনি। রানা জানে, ঘুম থেকে জাগার পর কি কথাবার্তা হয়েছে তার কিছুই লোকটার মনে থাকবে না।

'এত সব কাণ্ড কি নিয়ে?' করিডরে বেরিয়ে এসে সশব্দে হাঁফ ছাড়ল নিনি।

'লোকটা উন্মাদ, বস্!' শব্দ করে হেসে উঠল সার্জেন্ট। 'মৃত্যুনাম, মৃত্যুকাজ, ভগবান! সত্যবাবা নাকি বলে দিতে পারে ওরা কে কোথায় কখন থাকে! যত্তোসব গাঁজাখুরি গল্প।'

'চিন্তা করো, সার্জেন্ট।' রানার গলা গম্ভীর, চেহারা থমথমে। 'দু'জনেই তোমরা চিন্তা করে দেখো, লোকটা যা বলল তার অন্ত

নিহিত অর্থ কি হতে পারে। স্মরণ করো, কাল রাতে গ্লাসটনবারিতে কি ঘটেছে। তারপর দেখো, হাসতে পারো কিনা!'

কেবিন থেকে বেরিয়ে করিডরে ওদের সাথে মিলিত হলেন প্রফেসর ওয়েদারবাই। 'আমি একজন নার্সকে ডেকে পাঠিয়েছি, রানা। যে-ধরনের কথাবার্তা হলো, তারপর সিকিউরিটির ব্যবস্থা আরও কড়া না করে উপায় কি!' রানার মতই গম্ভীর তিনি।

'কিন্তু কি...?' শুরু করল নিনি।

'লোকটাকে আবার আমাদের সরিয়ে ফেলতে হতে পারে,' বলল রানা, নিনি আর সার্জেন্টের দিকে সবেগে ফিরল। 'এখনও তোমরা বুঝতে পারছ না?' কেবিনের দিকে একটা হাত তুলল ও। 'ওই লোক বিশ্বাস করে সত্যবাবা ঈশ্বরের মত সবজান্তা। কিন্তু তার আসল পরিচয় যে কি আমরা তো তা জানি। সত্যবাবাই পীর হিকমত বাগদাদী। দুনিয়ার অর্ধেকের বেশি টেরোরিস্ট গ্রুপের হাতে অস্ত্র যোগান দিচ্ছে লোকটা, তারপরও ব্যাখ্যা করার দরকার আছে, কি ধরনের বিপজ্জনক চরিত্র? ওই লোক,' আবার কেবিনের দিকে একটা হাত তুলল রানা, 'সবচেয়ে মারাত্মক নেশা, ধর্মীয় উন্মাদনার শিকার। সে, এবং তার মত হাজার হাজার সত্যদর্শী ব্যাপারটা বিশ্বাস করে।'

'কি বিশ্বাস করে? মৃত্যুনাম? মৃত্যুকাজ? কি বিশ্বাস করে ওরা, বস্?'

'সত্যি তুমি বুঝতে পারছ না, রেম্যান? অসম্ভব মনে হচ্ছে আমার। নাকি হাবাগোবার অভিনয় করছ, আমাকে শান্ত রাখার জন্যে?' বড় একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে অস্বস্তি প্রকাশ করল রানা। 'এবার আমাদের ফেরার জন্যে তৈরি হতে হয়। তার আগে

প্রফেসরের আরেকজন রোগিণীকে দেখব আমি, কয়েকজন ভিজিটরের সাথেও কথা বলব। যাও, গাড়িতে বসে আমার জন্যে অপেক্ষা করো তোমরা। আমি আসছি।' গাড়ির চাবিটা ওদের দু'জনের দিকে ছুঁড়ে দিল ও, যে পারে লুফে নেবে।

রানা জানে চাবিটা দিয়ে একটা ঝুঁকি নিচ্ছে ও। সুযোগ পাওয়ায় পালিয়ে যেতে পারে নিনি বা সার্জেন্ট। দু'জন একসাথে পালিয়ে গেলেও আশ্চর্য হবার কিছু নেই। খলিল ইব্রাহিমের অশ্লীল যুক্তি বুঝতে পারেনি ওরা, রানার কাছে এখনও ব্যাপারটা অবিশ্বাস্য লাগছে। সামান্য একটু ভুল হয়ে গেছে, নিনি আর সার্জেন্টের সামনে নিজের উপলব্ধি প্রকাশ করে ফেলেছে—ওদেরকে বুঝতে দিয়েছে, সত্যদর্শীদের হেঁয়ালিপূর্ণ কথাবার্তার অন্তর্নিহিত অর্থ জেনে ফেলেছে ও।

চাবিটাকে লুফে নিল সার্জেন্ট বিল রেম্যান। 'আমার বুদ্ধিতে কুলোচ্ছে না, বস্।' নিঃশব্দে হাসল সে। 'তবে আপনি যদি বলেন, সত্যদর্শীরা মৌলবাদে দীক্ষা নিয়েছে, ভূমিকা নিয়েছে ভাড়াটে খুনীর, তাহলে আলাদা কথা।'

'ঠিক তাই বলছি আমি, সার্জেন্ট—তুমিও তা জানো। যেমন জানো, সত্যদর্শীরা শুধুই ভাড়াটে খুনী নয়। ওদের মনে একটা বিশ্বাস ঢুকিয়ে দিয়েছে সত্যবাবা, সেজন্যেই মৃত্যুকে আলিঙ্গন করার জন্যে অপেক্ষা করছে তারা। আল্লাহ বলতে পারবে, এ অসাধ্যসাধন সে কিভাবে করছে। শুধু তার মুখের কথায় যে কাজ হয়নি, বাজি রেখে বলতে পারি। ঠিক আছে, যাও তোমরা। আমি আসছি।'

নিনির চেহারায় এখনও রাগ, সার্জেন্টের চেহারায় রাজ্যের

অবিশ্বাস। করিডর ধরে সিঁড়ির দিকে এগোল ওরা। সিঁড়ি বেয়ে উঠলেই আন্ডারগ্রাউন্ড থেকে পৌঁছে যাবে রিসেপশন রূমে।

'পরিস্থিতিটা সত্যি বিপজ্জনক,' ফিসফিস করে বললেন প্রফেসর। 'দেখো তো, ব্যাপারটা আমি ঠিকমত বুঝেছি কিনা। কেবিনের লোকটা সাধারণ সত্যদর্শীদের একজন। সত্যবাবা তাকে যা যা বলেছে, সব সে বিশ্বাস করে। তার ধারণা, দুনিয়াটাকে বিপ্লবের মাধ্যমে বদলাতে হবে। তার আরও ধারণা, যাদেরকে বাছাই করা হয়েছে তারা বিপ্লবের স্বার্থে মৃত্যুকে বরণ করে নেবে, এবং এই আত্যাগের বিনিময়ে এক ধরনের স্বর্গ পাবে হাতে।'

সায় দিয়ে মাথা ঝাঁকাল রানা। হঠাৎ ভীষণ ক্লান্তি অনুভব করল ও। 'হ্যাঁ, আমিও ঠিক তাই বুঝেছি। নতুন কিছু বলছে ওরা, ঠিক তা নয়। অনেক ধর্মপুস্তকে এ-ধরনের প্রতিশ্রুতি পাবেন আপনি। কিন্তু স্বর্গযাত্রীদের বৈশিষ্ট্য হলো, এরা স্বেচ্ছায় বরণ করে নিচ্ছে মৃত্যুকে। সুইসাইড স্কোয়াডের মত। সত্যবাবা নির্দেশ দিলেই মারা যাবার জন্যে তৈরি হয়ে যাচ্ছে ওরা।

'পীর হিকমতের রেকর্ড বলছে সন্ত্রাস নিয়েই ব্যবসা তার। এখানেও তাই দেখছি আমরা, সত্যদর্শীদের সাহায্য নিয়ে সন্ত্রাস বিস্তৃত করছে সে। বিশেষ ধরনের হত্যাকাণ্ড ঘটিয়ে ব্রিটেনকে নেতৃত্বহীন করার পরিকল্পনা নিয়েছে।'

রানার কাঁধে একটা হাত রাখলেন প্রফেসর ওয়েদারবাই। 'আমার ভয় লাগছে, রানা, আতঙ্ক বোধ করছি। মি. লংফেলোকে আমি বলব তিনি যেন আরও কড়া সিকিউরিটির ব্যবস্থা করেন।'

'তারপর ধরুন,' অন্যমনস্কভাবে বলল রানা, 'একজনের কথা

শুনে কেন যেন খুঁত খুঁত করছে আমার মন। ডোনা চেস্টারফিল্ডের ভাই। তার সাথে, তার কাকাদের সাথে দেখা করতে চাই আমি।'

সিকিউরিটির স্বার্থে ইব্রাহিম খলিল ওরফে জোসেফ গুজরালকে ক্লিনিকের সবচেয়ে নিচের তলায় রাখা হয়েছে। এলিভেটরকে পাশ কাটিয়ে কয়েক প্রস্থ সিঁড়ি ভেঙে তিনতলায় উঠল ওরা, ডোনাকে যেখানে রাখা হয়েছে।

তার কেবিনের বাইরে কোন পাহারা নেই, করিডরেও গার্ডদের কাউকে দেখা গেল না। রানার তলপেটের ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠল, হাঁটার গতি বাড়িয়ে দিল ও, তারপর ছুটতে শুরু করল। ওকে ধরার জন্যে প্রৌঢ় প্রফেসরও হন হন করে হাঁটছেন, তাঁর চেহারাও কালো হয়ে গেছে।

এক ধাক্কায় দরজা খুলে স্থির হয়ে গেল রানা। আতঙ্কে যেন এক সেকেন্ডের জন্যে পাথর হয়ে থাকল ও। প্রথমে নার্সকে দেখতে পেল ও, হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে আছে মেঝেতে, মাথাটা অসম্ভব বাঁকা হয়ে আছে একদিকে। গোটা কেবিনের ওপর দিয়ে যেন প্রচণ্ড একটা ঝড় বয়ে গেছে—বিছানার কিনারা থেকে নিচের দিকে ঝুলে রয়েছে ডোনার অর্ধেক শরীর। ভয়ঙ্কর স্থির লাগল তাকে। লম্বা চুল মেঝেতে লুটোচ্ছে। সেলাইনের সুঁচ হাত থেকে ছিঁড়ে নেয়া হয়েছে।

'সর্বনাশ হয়ে গেছে! আমিই দায়ী!' দম ফেলল রানা, ওকে ধাক্কা দিয়ে পাশ কাটালেন প্রফেসর। 'ওদের দু'জনকে একা ছাড়াই উচিত হয়নি আমার!' জ্যাকেটের ভেতর থেকে অস্ত্রটা বেরিয়ে এল ওর হাতে, ঘুরল, সিঁড়ির দিকে ছোটার জন্যে তৈরি।

ডোনার পাশ থেকে প্রফেসরের গলা শুনতে পেল রানা,

বলছেন, মেয়েটা এখনও বেঁচে আছে। হাত বাড়িয়ে একটা বোতামে চাপ দিলেন তিনি, নার্সদের সাহায্য চাইবেন।

‘পাঠিয়ে দিচ্ছি কাউকে,’ বলে সিঁড়ির দিকে ছুটল রানা। এই সময় ইউনিফর্ম পরা একজন নার্সকে দেখা গেল সিঁড়ির মাথায়। ‘তাড়াতাড়ি কেবিনে যান!’ চিৎকার করল ও। ‘প্রফেসর ওয়েদারবাই আপনাকে খুঁজছেন।’

কিন্তু কাছ থেকে লক্ষ করল রানা, ঘন ঘন হাঁপাচ্ছে নার্স। মুখে রক্তের ছিটেফোঁটাও নেই। চেহারা দেখে মনে হলো কেঁদে ফেলবে। ‘নিচতলায়!’ ফুঁপিয়ে উঠল নার্স। ‘নিচতলায় সিকিউরিটির লোকজন! কেউ তারা...ওমা গো!’ হাউমাউ করে কেঁদে উঠল সে। ‘কেউ তারা বেঁচে নেই...প্লীজ, জলদি! ওদের মধ্যে আমার স্বামীও...!’

‘প্রফেসর ওয়েদারবাইয়ের কাছে চলে যান,’ নির্দেশ দিল রানা। ‘বাকি সব আমি সামলাব।’ তিনটে করে সিঁড়ি টপকে নামতে শুরু করল ও।

হাতে উদ্যত পিস্তল, নিচতলার করিডরে নেমে এল রানা। সিকিউরিটি রূমটা এখানেই। ইস্পাতের দরজাটা খোলা রয়েছে। দোরগোড়ায় এক মুহূর্তের জন্যে থামল ও, ভেতরের দৃশ্যটার ওপর দ্রুত চোখ বুলিয়ে নিল। দু'জন গার্ডই মারা গেছে। কামরাটা ছোট, প্রথমদর্শনে ওর মনে হলো, এত ছোট জায়গায় এত বেশি রক্ত আগে কখনও দেখেনি।

লোকগুলোর জন্য করার কিছু নেই, এক ছুটে রিসেপশন রূমের সামনে চলে এল রানা। এখানেও নৃশংসতার চূড়ান্ত করা

হয়েছে। বিস্মিত হলো রানা, এতগুলো লোককে মেরে ফেলা হলো অথচ কোন শব্দ ওরা পেল না!

কামরাটার ভেতর সাবধানে ঢুকল রানা। ঢোকার সময় মনে পড়ে গেল ব্যাপারটা, বুঝতে পারল কি কারণে খুঁত খুঁত করছিল ওর মন। ডোনার এক ভাই সত্যি ছিল বটে! ছিল। ডোনার ভাই গিলবার্ট পাঁচ বছর আগে মারা গেছে রোড অ্যাক্সিডেন্টে। সুইটজারল্যান্ডে না কোথায় যেন।

কিন্তু এখন কোন লাভ আছে, মাথার চুল ছিঁড়ে?

(আগামী খণ্ডে সমাপ্য)